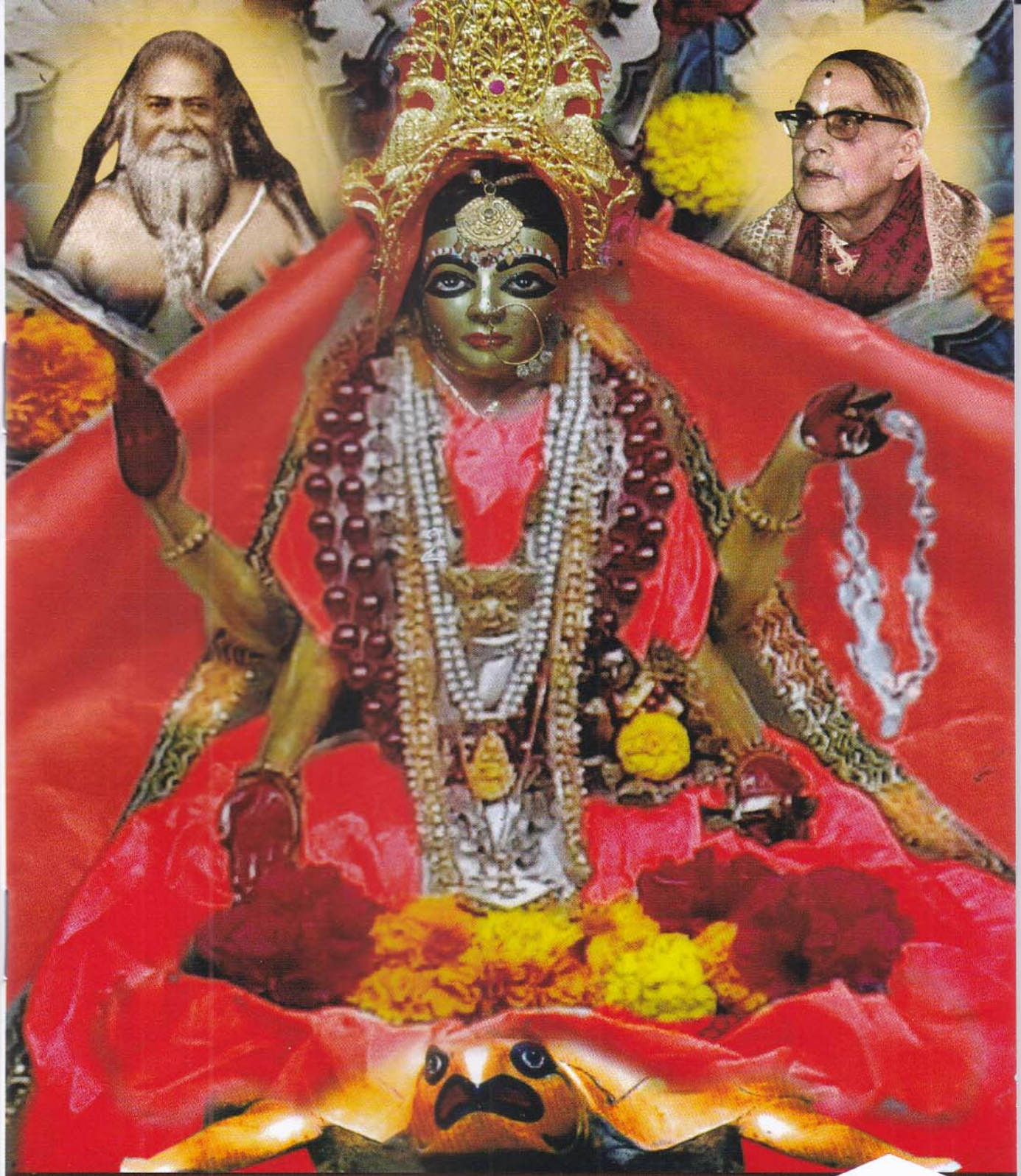

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
শারদীয়া সংখ্যা
২০২৩

"জাগরণে যারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি দেখা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
সদা মনে হয় সে যে কাছে নাই;
যেন এ আমার আকুল আবেগ,
তাহারে আনিবে ডাকি,
দিবস রজনী আমি যেন কার আশার আশায় থাকি।"

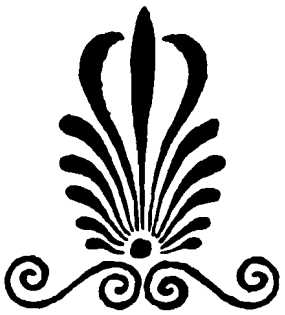

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
সুমিত্রা, নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

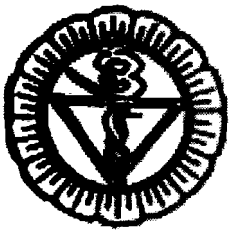

৬২তম বর্ষ ● শুভ শারদীয়া ১৪৩০ সন ● তৃতীয় সংখ্যা

সেক্রেটারী: শ্রী সুরজিৎ দে

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

সূচীপত্র

সৎ-প্রসঙ্গ	শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ	৬৪
গীতার মর্ম	শ্রীদেবপ্রসাদ রায়	৬৬
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার	ডঃ রমা চৌধুরী	৬৯
পুণ্য-পরশ-পুলক (১১ পর্ব)	শ্রীবসুমিত্র মজুমদার	৭২
মূর্তি পূজার আবশ্যকতা	শ্রীমতী দীপ্তি ব্যানার্জী	৭৫
পুজো সম্বন্ধে কিছু কথা (পর্ব -১)	শ্রীসোমনাথ সরকার	৭৭
শ্বেতকালী, মাতা রাজবল্লভী	শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়	৮১
MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY (LIST OF DONORS)		৮৩
শ্রীমৎদর্শনানন্দজীর শ্রীমুখে		৮৫
দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী		৮৭
করুণানিধান তথাগত	শ্রীবিবেকাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৮৯
মাতৃ আবাহন	শ্রীমতী অরুণিমা বসুমল্লিক	৯২
দেব মহারাজ	শ্রীমতী মেখলা দত্ত	৯২
ভক্তিতে মুক্তি	শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল	৯৩
"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" (সম্পাদকীয়)		৯৫

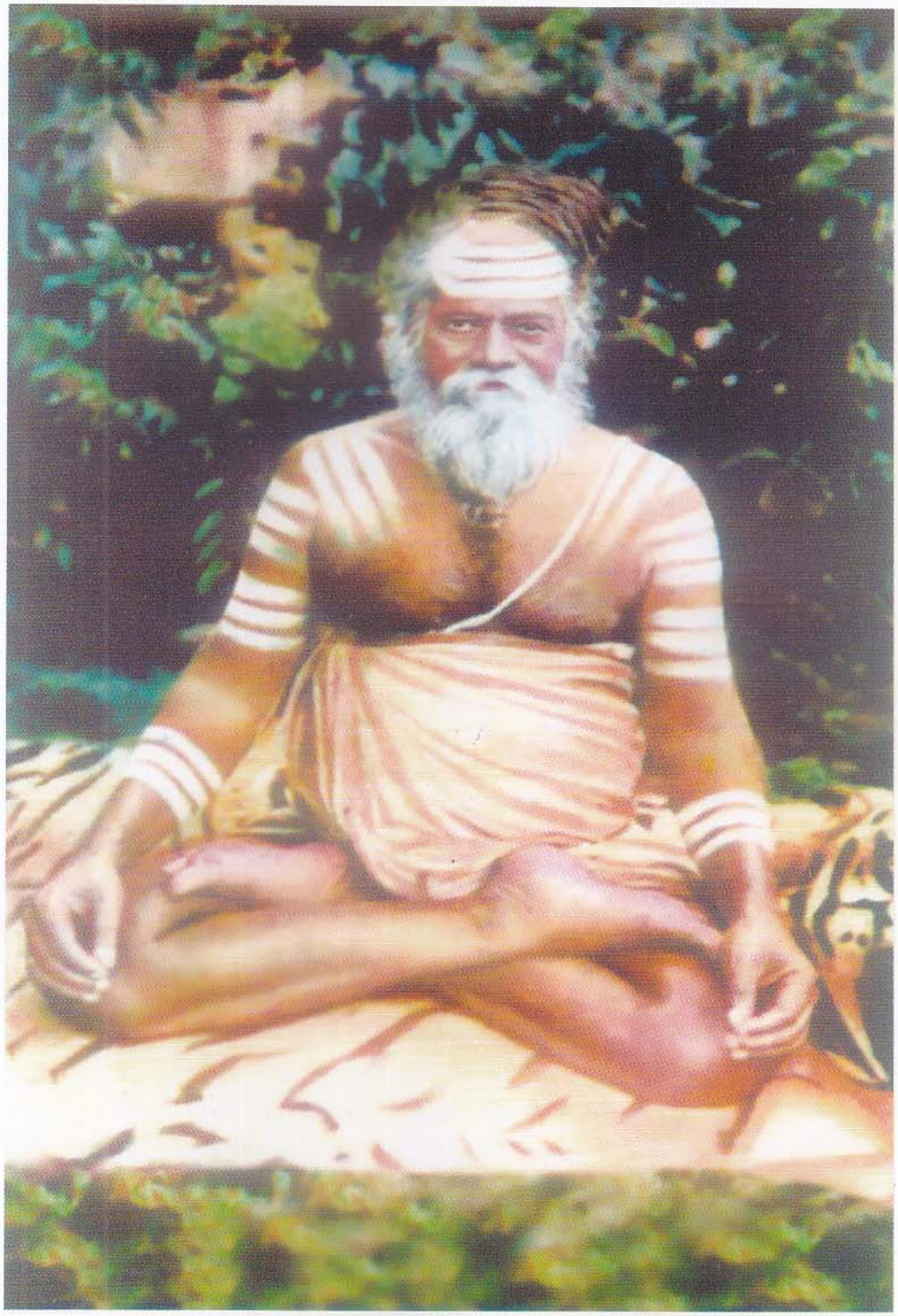

শ্রীশ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর স্মরণে শ্রী অরূপ সেন ও শ্রীমতী কাবেরী সেনের— সৌজন্যে।

সৎ প্রসঙ্গ

পূর্ববর্তী সংখ্যার পর

ভগবান বললেন -

"জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।"

এইজন্য শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা, আমাদের কর্তব্য অবধারণ ক'রে দৃঢ় ভক্তির সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাসের সঙ্গে সেই সাধনাই আমাদের নিত্য করতে হবে। এই নিত্য করবার একমাত্র উপায় হল - যে বস্তু আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত ক'রে, চঞ্চল ক'রে অনিত্যতার দিকে নিয়ে যায়, তাকে বর্জন করতে হবে। সর্বদাই আমাদের সাধনার ভিতর নিযুক্ত থাকতে হবে। এইজন্য ব্রত, নিয়ম, শম, জপ, ধ্যান, শাস্ত্র অধ্যয়ন যা কিছু আমাদের পারমার্থিক চিন্তা করছি, পারমার্থিক কর্তব্য করছি, পারমার্থিক ক্রিয়া করছি, এ সমস্তেরই মূল উদ্দেশ্য হ'ল ভগবানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করা। এই ভগবৎ অনুশীলনের জন্য যে প্রচেষ্টা তারই নাম ভক্তি। অব্যাভিচারিণী ভক্তি।

অব্যাভিচারিণী মানে - আর অন্য বস্তুতে লোভ আসছে না, একমাত্র ভগবানের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। যেমন - নদীর প্রবাহ। অনবরোধ্য তার গতি। নিত্য নিরন্তর বহু পাহাড়, পর্বত, পাথর, বাধা বিপত্তি, নগর জনপথ সকল অতিক্রম করে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হচ্ছে। আমাদেরও মনোবৃত্তিটা নিত্য নিরন্তর ভগবানের দিকেই ধাবিত হয়েছে। কিন্তু জগতের বাধা-বিপত্তি, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক - এই ত্রিতাপের দ্বারা ভ্রষ্ট হয়ে আমরা আমাদের প্রকৃত পন্থা ভুলে যাচ্ছি। প্রকৃত পন্থায় না গিয়ে বক্রপন্থায় চলে যাচ্ছি। গেলেও কিন্তু ভগবান আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন।

"ও পথে যেও না, ফিরে এসো বলি
কতবার আমায় বলেছ।
আমি তবু চলে গেছি - ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে আমার গিয়েছ।।"

খুব আসক্তি রয়েছে, পুত্রটি হয়ত মারা গেল। খুব আসক্তি রয়েছে, ধনটি হয়ত অপসৃত হয়ে গেল। এই সবের দ্বারা ভগবান আমাদের আঘাত দিয়ে অনিত্য বস্তুর প্রতি যে আসক্তি, সেটা যাতে আমরা নিবৃত্ত করতে পারি, জ্ঞানতঃ যাতে আমাদের মন থেকে পরিহার করতে পারি, সেজন্য দুঃখ, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু এসব আমাদের দিয়েছেন। বিষয় থেকে যাতে আমাদের আসক্তি চলে যায়, ভগবানের প্রতি যাতে আসক্তি হয়, সেজন্য তিনি সর্বদাই চেষ্টিত রয়েছেন। আমরা যতই তাঁকে দুরে বর্জন করছি, ততই তিনি আমাদের দুঃখ, ত্রিতাপ, নানাপ্রকার অভিঘাত দিয়ে তাঁর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। সেইজন্য সকলকে আমরা বর্জন করতে পারি, কিন্তু ভগবানকে আমরা বর্জন করতে পারি না। তেমনি ভগবানও - 'কর্তুম অকর্তুম্ অন্যথা কর্তুম' ক্ষমতাসম্পন্ন। তিনি একটি জিনিস করতেও পারেন। যেটা করেছেন, সেটা নষ্টও করতে পারেন এবং যেটা কখনো হয় নি, সেটাও করতে পারেন। এত তাঁর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও একটি কাজ তিনি করতে পারেন না। সেটা হ'ল আমার থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। তাহ'লে আমারই সত্তা থাকবে না।

সুতরাং আমার সত্তাকে উপলব্ধি করছি, তাঁর সত্তা দিয়ে। এইজন্য তাঁর নাম - সৎ, মানে - Universal existence. এই Universal existence (বিশ্বজনীন অস্তিত্ব) এর উপরেই individual existence (ব্যক্তিগত অস্তিত্ব) নির্ভর করছে। আমাদের যে ব্যক্তিত্ববোধ তাঁর সেই সমষ্টিগত সত্তাবোধের উপর রয়েছে। তিনি যদি না থাকতেন, জ্ঞানরূপে তিনি যদি আমাদের ভিতর প্রকাশিত না হতেন, আমরা পাথরের মত জড় হয়ে থাকতাম। নিজেকেও জানতে পারতাম না, জগৎকেও জানতে পারতাম না।

"অন্ধেন নিয়মানা যথা অন্ধাঃ" এক অন্ধ যেমন অপর অন্ধকে নিয়ে যায়, তারপর দুজনেই যেমন গর্তের ভিতর পড়ে, তেমনি আমরাও যদি ভগবানকে বাদ দিয়ে, নিজেদের অহংকারের বশবর্তী হ'য়ে জগতের ভিতর চলি, আমরাও সেইরূপ অন্ধকারের গর্ভে গিয়ে পতিত হব।

তদ্ ভাসা সর্বমিদং বিভাতি। সর্বমিদং ক্রিয়াতি।।

ভগবানের জন্য এই যে সূর্য্য দেখছি, চন্দ্র দেখছি, এ সবেরই হলো ধার করা প্রকাশ।

"ত্বমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।" (কঠ ২।২।১৫)

চোখ যদি না থাকতো, জগতটাকে দেখতে পারতাম না। কিন্তু চোখের আলো কে দিচ্ছেন? তিনিই দিচ্ছেন, তিনি আমাদের চক্ষুর ভিতর চৈতন্যরূপে যদি না থাকতেন, চক্ষু দিয়ে কাউকে দেখতে পেতাম না।

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
চক্ষুষশ্চক্ষুঃ স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।" (কেন -- ব্রহ্মস্বরূপম্)

আমাদের চক্ষুটা দ্রষ্টা নয়। চক্ষুর অন্তরালে চৈতন্যরূপী যে ভগবান, তিনিই হলেন দ্রষ্টা। জগতের চক্ষু যদি নষ্ট হয়ে যায়, তার মানে যন্ত্রটা বিকল হয়ে গেল। যে যন্ত্রের ভিতর তিনি নিজেকে প্রকাশ করছিলেন, যন্ত্রটা খারাপ হওয়াতে যন্ত্রী আর নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন না।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।। (গীতা ১৩/১৪)

তিনিই চৈতন্যরূপে সকল ইন্দ্রিয়ের যা কিছু গুণ প্রকাশ করছেন, অথচ ',সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্'! তিনি যেমন transcendent, তেমনি immanent, সর্বঅনুগ, সর্বঅতীত! এ দুয়ের সমন্বয় একমাত্র ভগবানেই সম্ভবপর। এটা মানুষের পক্ষে বা জগতের অন্য কোন বস্তুতে সম্ভব নয়। তিনি যেমন নির্বিশেষ, তেমনি আবার সবিশেষ। তিনি যেমন নির্গুণ, তেমনি আবার গুণের ভোক্তা! এইজন্য তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদের কোন সত্তা নেই। এটা উপলব্ধি করার জন্য ভক্তিই হ'ল একমাত্র সাধনা।

ভক্তির দ্বারা তাঁকে আমরা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি ক'রে, নিত্য তাঁর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন ক'রে জগতের কর্তব্য পালন করব। 'হাতে কাম মুখে রাম...' সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে সর্বদাই তাঁকে স্মরণ করব - এইটিই হল শ্রেষ্ঠ সাধনা।

গীতার মর্ম

শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

গো - ইন্দ্রিয়; **বিন্দতি** - পালন বা অধিষ্ঠান করা। ইন্দ্রিয়গণের পরিপালক বা অধিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ। (পৃ ৮০)

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাং স্ত্যক্ত্বাধনানি চ।

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।। ১/৩৩

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।। ১/৩৪

- আচার্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ ধন ও জীবনের আশা পরিত্যাগকরে এই যুদ্ধে উপস্থিত হয়েছেন। হে মধুসূদন! এঁরা আমাদের বধ করলেও আমি এদের কোনরূপে নষ্ট করতে ইচ্ছা করি না।

মধুসূদন - মধুনামানমসুরং সূদিতবান্ ইতি মধুসূদনঃ।

ইনি মধু নামে দৈত্যকে সংহার করেছেন, তাই ইনি শ্রীমধুসূদন নামে খ্যাত। **কর্ণমিশ্রোদ্ভবং চাপি মধুনাম মহাসুরম্। ব্রহ্মনোঽপচিতিং কুর্বন্ জঘান পুরুষোত্তমঃ।। তস্য তাত বধাদেব - দেবদানব মানবাঃ। মধুসূদন ইত্যাহু র্ঘষেযশ্চ জনার্দনম্।। (ম,ভা - ভীষ্ম ৬৭/১৪-১৫)** ইনি মধু নামে দৈত্যকে সংহার করেছেন, তাই ইনি মধুসূদন নামে খ্যাত। স্বীয় কর্ণেন্দ্রিয় সমুদ্ভুত মধুনামে ভয়ঙ্কর অসুর ব্রহ্মাকে বিনাশ করতে উদ্যত হলে শ্রীভগবান তাকে সংহার করেছিলেন। এই হেতু দেব, দানব ও মনুষ্যেরা তাঁকে মধুসূদন এবং মহর্ষিরা জনার্দন নামে সম্বোধন করে থাকেন।

অপি ত্রৈলোক্যরাজস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।

নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।। ১/৩৫

- ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্ত হলেও আমি যাঁদের বিনষ্ট করতে চাই না, তবে কি সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ পৃথিবীর রাজত্বের জন্য তাঁদের বধ করব? হে জনার্দন! দুর্যোধনাদিকে সংহার করে আমাদের কি সুখই লাভ হবে?

ব্যাখ্যা - **জনার্দন - জনান্ দুর্জনা নর্দয়তি হিনস্তি নরকাদীন্ গময়তীতি বা জনার্দনঃ জনৈপুরুষার্থমভ্যুদয় নিঃশ্রেয়লক্ষণং যাচ্যতে ইতি জনার্দনঃ** - জন (লোক) অর্থাৎ দুর্জন ব্যক্তিকে যিনি হিংসা করেন, তিনি জনার্দন। অথবা দুর্জন ব্যক্তিকে যিনি নরকে পাঠিয়ে দেন তিনি জনার্দন। অথবা জনগণ যার কাছে অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) এবং নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) যাজ্ঞা করে তিনি জনার্দন।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।

তস্মাৎ (সেহেতু) **ন অর্হ** (চাহি না)

তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।

স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব।। ১/৩৬

যদিও এরা আততায়ী (এবং আততায়ি বধে পাপ নেই, শাস্ত্রে কথিত আছে), তবু বন্ধু বান্ধবগণসহ ধার্তরাষ্ট্রগণকে আমরা বধ করতে চাই না। এতে আমরা পাপভাগী হব। হে মাধব! আত্মীয়গণকে বধ করে আমাদের কি সুখ হবে?

ব্যাখ্যা - আততায়ি - স্মৃতি এবং অন্যান্য শাস্ত্র আততায়ীদের বধের আদেশ করেছেন। স্মৃতিতে বলেছেন - **আততায়িনং আয়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়ি বধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।।** আততায়ীকে নিকটে আসতে দেখলে কোনও বিচার না করে তাকে হত্যা করবে। যেহেতু আততায়ীকে বধ করলে হত্যাকারীর কোনও দোষ হয় না। বশিষ্ঠ সংহিতাতে **আততায়ী** শব্দের সংজ্ঞা দিচ্ছেন - **অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহর্তা চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ।।** (৩/১৯) গৃহে অগ্নিপ্রদানকারী, খাদ্যে বিষদানকারী, বধের জন্য শস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ভূ-সম্পত্তিহারী, স্ত্রীহরণকারী, এই ছয় প্রকারের মানুষ আততায়ী। স্মৃতি বলেন - আততায়ি **বধে পাপ নেই**। অর্জুন বলছেন - আততায়ী হলেও এদের বধে পাপ আছে। অর্জুনের যুক্তি এই **ধর্ম সঙ্গত কার্যে পাপ** হয় না। কিন্তু এই যুদ্ধ কার্য ধর্মসঙ্গত নয়। কারণ যে চারটি লক্ষণ দ্বারা কর্মকে ধর্মসঙ্গত বলা যায় তার কোন লক্ষণই এই কার্যে নাই। যে কার্য বেদসম্মত নহে, স্মৃতি সম্মত নহে, যে **কর্মে আত্মতুষ্টি নাই**, যে কার্য শিষ্টাচারসম্মত নহে, সেই কার্যই পাপ কার্য। যথা -

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্।। মনু - এই স্বজন বধকার্য বেদ, স্মৃতি, সদাচার, আত্মতৃপ্তি - এর **সবগুলিই বিরোধী**।

(১) ইহা **বেদবিরুদ্ধ** - যেহেতু শ্রুতি বলেছেন - **ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি** - কোন প্রাণীর হিংসা করবে না।

(২) ইহা **স্মৃতিবিরুদ্ধ** - কারণ স্মৃতিকর্তা যাজ্ঞবল্ক্য মতে -

স্মৃত্যোবিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ।

অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবর্ম শাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।।

যদিও অর্থ শাস্ত্রমতে **নাততায়ি বধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন**" অর্থাৎ আততায়িবধে বধকর্তার কোনও দোষ নেই, কিন্তু অর্থশাস্ত্র কেবল লৌকিক উপকারের জন্য। **বহুলোকের মহান** উপকার যাতে হয়, তা-ই অর্থ শাস্ত্র মতে ধর্মসঙ্গত কর্ম। যদিও এই যুদ্ধে আত্মীয় **বিনাশ হলেও** দুর্যোধনাদি পাপীর বিনাশে জগতে মহৎ ইষ্ট হবে বলে একে ধর্মসঙ্গত বলা যায়, তথাপি **এই অর্থশাস্ত্রের** এই সিদ্ধান্তে শ্রুতির **ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি** বাক্যের বিরোধী। এইজন্য শ্রুতিবাক্যগ্রাহ্য ও **এই যুদ্ধ ধর্মসঙ্গত** নহে।

(৩) **আত্মতুষ্টি বিরুদ্ধ** - এই কার্যে আমার কিছুমাত্র আত্মতুষ্টি নেই, **বরং পুনঃ পুনঃ আত্মগ্লানি** হচ্ছে।

(৪) **শিষ্টাচার বিরুদ্ধ** - আচার্য গুরুজন, স্বজনাদি বিনাশ যে **শিষ্টাচার বিরোধী**, তা ত সকলের জানা।

মাধব - মা - লক্ষ্মী, শ্রী এবং **ধব** - পতি। তুমি শ্রীপতি হয়ে **আমাকে আত্মীয় বা** বন্ধুবান্ধব বা

শ্রীহীন হতে উপদেশ হতে।

আমাদের আত্মোন্নতির পথে যা অবরোধ করে, তা-ই পাপ। বস্তুতঃ পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই। একই জিনিষ অবস্থা ভেদে পাপ বা পুণ্য বলে গণ্য হয়। এক অবস্থায় যা আত্মোন্নতির জন্য গ্রহনীয়, অবস্থান্তরে তা পরিত্যাজ্য - এক অবস্থায় যে কার্য আমাদের মাতৃসন্নিধানে এগিয়ে নিয়ে যায়, তা-ই আবার আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কার্যে কোন গুণ নেই, গুণ আমাদের স্ব স্ব অভ্যন্তরে। যতক্ষণ নিজের কর্তৃত্ব ছাড়া অন্য কোন কর্তৃত্ব দেখতে না পাব, না নিজের চেষ্টা থেমে গিয়ে ভগবৎ-শক্তির উপর নির্ভর করতে শিখব, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়াদির মায়া আমাদের উপকারী। ঈশ্বর-নির্ভরতা এসে গেলে, অগতির গতি বলে যথার্থ তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে তখন আর ও মায়ার আবশ্যকতা নেই।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহত চেতসঃ।

কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্।। ১/৩৭

যদ্যপি (যদিও) **এতে** (এরা) **লোভোপহতচেতসঃ** (লোভাভিভূত চিত্ত),

যদিও লোভাভিভূত চিত্ত দুর্যোধনের পক্ষীয়গণ কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহজন্য পাপ দেখছেন না।।

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।

কুলক্ষয় কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন।। ১/৩৮

কিন্তু হে জনার্দন! আমরা কুলক্ষয় জনিত পাপ দেখেও কি জন্য তা থেকে নিবৃত্ত হব না?

ব্যাখ্যা - যদিও দুর্যোধনের পক্ষে মহামতি ভীষ্মাদিমহোদয়গণ তো বন্ধু বান্ধব হননে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অর্জুন বলছেন তা হলেও তাঁদের আচরণ এখানে অনুকরণীয় নহে, কারণ তাঁদের চিত্ত এখন লোভাভিভূত। মহাত্মগণ যখন নিঃস্বার্থভাবে কোন কার্য করেন, তা অবশ্যই শিক্ষণীয়। কিন্তু যখন লোভের বশবর্তী হয়ে কার্য করেন, তা কোন মতেই শিক্ষা যোগ্য নহে।

এখানে মহামতি ভীষ্ম ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারেই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হয়েছেন। তিনি স্বধর্ম পালনকালে অর্জুনের মত ব্রহ্মণ্য ধর্মের ভাবোচ্ছ্বাসে সন্দিগ্ধচিত্ত হননি। তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্ম নিষ্কামভাবে যুদ্ধার্থে ব্রতী হয়েছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় তাঁকে নিজ নিধনের উপায় বলে দিয়ে ক্ষত্রিয়চিত ধর্মযুদ্ধ মাত্র করেছিলেন।

অর্জুন বোঝাতে চাইছেন যে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, আত্মীয় স্বজনকে বধ করতে না চাওয়া, এ সমস্তই ধর্মের দ্বারা, ধর্মবুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হয়ে তিনি করছেন।

ক্রমশঃ

কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার

ডঃ রমা চৌধুরী

(পূর্বে প্রকাশিত)

একটী মহাদেশ তুল্য বিশাল-বিরাট আমাদের পুণ্যভূমি, ধন্যভূমি, **অনন্যভূমি এই** ভারতবর্ষ -বহু বিবিধ-বিচিত্র ধর্ম দর্শন, ভাষা-সাহিত্য সভ্যতা সংস্কৃতি বেশভূষা, **কথাবার্তা, আচারাচরণ** প্রভৃতির লীলাভূমি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষ এক ও অভিন্ন - ভেদের **মধ্যে, অভেদ, বহুর** মধ্যে এক, বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনের মূর্ত প্রতীক। এই কারণেই, মানব সভ্যতার **প্রথম উষাগমে এই** অত্যাশ্চর্য ভারতের পবিত্র তপোবনে রণিত-অনুরণিত করে উত্থিত হয়েছিল সেই **অনুপম মিলন মন্ত্র** ঃ-

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।। (ছান্দোগ্যোপনিষদ **৩/১৪/১**)

"ইদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ) **২/৫/১**

"তত্ত্বমসি" (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬/৮/৭-**১৮,৯ বার**)

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম।। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ **৩/৫/৯**)

"অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ **১/৪/১০**)

অর্থাৎ - "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম।"

"ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।"

তিনিই তুমি" (পরমাত্মাই জীবাত্মা)

"এই আত্মাই (জীবত্মাই) ব্রহ্ম।"

"আমিই (জীবাত্মাই) ব্রহ্ম।"

এই প্রসঙ্গে, আরেকটি পরম রমণীয়, রসঘন, রোমাঞ্চকর **মন্ত্রের কথাও আমরা** শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রীতির সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করতে পারি। সেটী হল জগতের **প্রাচীনতম গ্রন্থ বিশ্ববন্দ্য** ঋগ্বেদের শেষ মন্ত্র, যেটি সুর-তান-লয়ে মূর্ত করে তুলেছিলেন আধুনিক যুগের **ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ** ঃ -

"সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি **জানতাং**।
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী, সমানং মনঃ **সহ চিত্তমেষাং**।
সমানী ব আকূতিঃ সমনো হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনে যথা বঃ সুসহাসতি।।"
ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৯১ সুক্ত ২,৩,৪ ঋক্)

অর্থাৎ - "এক হোক গতি, এক শুভমতি
এক হোক পূত ভাষা।
এক হোক **মন্ত্র**, এক সিদ্ধিতন্ত্র,
এক হোক চির আশা।

এক হোক চিত্ত, এক হৃদি নিত্য,
এক হোক মধুমন।
এক হোক প্রাণ' এক ধ্যানজ্ঞান,
মধুর হোক মিলন।।"

এরূপ মহামিলনই হল যুগ যুগান্তব্যাপী ভারতীয় আদর্শের মূল উৎস। এবং এরূপ উদার সার্বজনীন, সর্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ভারতবর্ষের পরম গৌরব কারণ "সর্বধর্মসমন্বয়ের" মহাতত্ত্ব। সাধারণতঃ ধর্মে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক দিক থেকে কয়েকটী বিশেষ নির্দেশ থাকে, যা সেই ধর্মাবলম্বীকে আবশ্যক ভাবেই পরিপালিত করতে হয়। যা তাঁরা পরেন না, অথবা করেন না, তাঁদের স্থান ঐ ধর্মে থাকে না - উপরন্তু তাঁদের বলা হয় পাপীতাপী। মুক্তি বা শ্রীভগবান কাজের সম্পূর্ণরূপে অযোগ্য - যেহেতু তাঁদের মতে ঐ বিশেষ ধর্মটীই একমাত্র ধর্ম, মোক্ষ অথবা ঁপরম দেবতা লাভের একমাত্র উপায়। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে - এরূপ মতবাদ সঙ্কীর্ণতা দোষদুষ্ট বহুল পরিমাণে। কারণ, পৃথিবীতে কোটী কোটী মানব রয়েছেন এবং স্বভাবতঃই সকলের বাসনা-কামনা শক্তি-সামর্থ্য অনুভূতি-উপলব্ধি প্রভৃতি এক ও অভিন্ন নয়। অতএব যোগ্য-অযোগ্য, উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মুর্খ, ধনী-নির্ধন, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই সেই একই পথে চালাবার প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই মূর্খতা ও বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নয়; এবং জগতের তথাকথিত "ধর্মযুদ্ধ" অথবা ধর্মে ধর্মে বিরোধই মানব সমাজের বহু অনিষ্টের মূল, বহু অমঙ্গলের কারক; বহু দুঃখের হেতু।

কিন্তু পরম করুণাময় পরম-পুরুষ পরমাত্মা মানুষের এরূপ অকারণ যুদ্ধবিগ্রহাদির এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অসহনীয় দুঃখশোক দর্শন করে, তাঁর দূত প্রেরণ করেন সংসার পঙ্কে নিমজ্জিত জীবকে উত্তোলন করবার জন্য।

মধ্যযুগে এরূপই একজন যুগাবতার ছিলেন সার্থক নামা ঁমহাপ্রভু শ্রীল শ্রীচৈতন্যদেব।

মধ্যযুগে সম্পূর্ণ একা একা তিনি সকল প্রকার ভেদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন নির্ভয়ে, আনন্দে আগ্রহে। যে যুগে নারী শূদ্রের বেদপাঠ, বেদ-উচ্চারণ, বেদ-শ্রবণাদি ঘোরতর পাপরূপেই গণিত হত, সেই যুগে তিনি কাজী প্রভৃতির উৎপাতাদির অবসানকল্পে উচ্চকণ্ঠে, প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে বলেছিলেন -

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুলবিগ্রহ নহে ভজনের যোগ্য।।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীনছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার।।" (চৈতন্যচরিতামৃত ৩।৪।৬২-৬৩)

"চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।"
"হরি ভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।।"

আধুনিক যুগে, ঁ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও সমভাবে প্রচার করলেন তাঁর সেই অত্যন্ত উদার সঙ্কীর্ণতাবিমুখ, সার্বজনীন তত্ত্বঃ -

"যত মত তত পথ।।"

তিনি নিজে সকল ধর্মে দীক্ষিত হয়ে, সেই সকল ধর্মের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিকদ্বয় সাক্ষাৎ ভাবে উপলব্ধি ও অনুশীলন করে, ভারতবর্ষের সেই শাশ্বত সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহাবাণী দিকেদিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করলেন সগৌরবে।

"ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। কিন্তু তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। তাঁকে যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে যার ভালো লাগে, সে সেই নামে ও সেই ভাবে তাঁকে ডাকলে তাঁর দেখা পায়।"

"যেমন সব নদীই বিভিন্ন পথ দিয়ে বয়ে বয়ে এসে, শেষ পর্যন্ত একই সমুদ্রে পতিত হয়, ঠিক তেমনি সেই একই ঈশ্বরের কাছে যাবার বহু পথ আছে - প্রত্যেক ধর্মই সেই এক একটী পথ।"

"যেমন হিন্দুরা বলেন জল,' মুসলমানরা বলেন 'পানি," খৃষ্টানরা বলেন "ওয়াটার" - কিন্তু জল ত সেই একই। ঠিক তেমনি, ঈশ্বরেরও অনন্ত নাম ও অসংখ্য রূপ - কিন্তু তিনি ত সেই একই - তাঁকে যে নামে ও যে রূপেই পূজা করা হোক না কেন।"

এরূপে ধর্ম বিষয়ে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দানের তিনি ছিলেন আদ্যন্ত কাল শ্রেষ্ঠ পূজারী।

মহান ভারতের যুগ যুগান্তব্যাপী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক মহাভারতে সেজন্য বলা হয়েছে স্থির বিশ্বাস ভরে -

"ধর্মং যো বাধতে ধর্ম্ম: - ন স ধর্মং কুধর্ম তৎ।
অবিরোধাস্তু যো ধর্মঃ সঃ ধর্মঃ ইতি নিশ্চয়ঃ।।"

(মহাভারত বনপর্ব ১৩১।১১-১৩)

" যে ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের বিরোধ হয় সেই ধর্ম ধর্ম নয়, কুধর্মই মাত্র। কিন্তু যে ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের বিরোধ নেই - সেই ধর্মই প্রকৃত - প্রকৃষ্ট ধর্ম।।

পরিশেষে, ভারতদর্শনসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সম্বন্ধে সামান্য দু' একটী কথা বলে শেষ করছি। এই পূজ্য গ্রন্থে নানাবিধ সাধনের কথা - বলা হয়েছে, যথা ঃ-

কর্মযোগ (২) ৪০ - ৪১, ৪৫ - ৫৩ (তৃতীয় অধ্যায়)

জ্ঞানযোগ (চতুর্থ অধ্যায়)	জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ (সপ্তম অধ্যায়)
সন্ন্যাসযোগ (পঞ্চম অধ্যায়)	ভক্তিযোগ (দ্বাদশ অধ্যায়)
ধ্যানযোগ (ষষ্ঠ অধ্যায়)	প্রপত্তিযোগ (১৮।৬৬) ইত্যাদি।

এই সঙ্গে, একথাও অন্ততঃ দু'জায়গায় বলা হয়েছে যে (৪।১১, ৭।২১) ঃ যথা -

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্বশঃ।। (৪।১১)

"যে যে প্রকারে আমার উপাসনা করে, আমি তাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি। মনুষ্যগণ সর্বভাবে আমারই পন্থা অনুসরণ করে।"

অর্থাৎ - সব পথই শ্রীভগবানের পথ, শ্রীভগবানের লাভের পথ।"

(পরবর্তী অংশ ৭৪ নম্বর পৃষ্ঠায়)

পুণ্য পরশ-পুলক (১১শ পর্ব)

শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

কী ভাবে যে তিনি নিয়ত কৃপা করে চলেছেন, তা বলে শেষ করা যাবে না। সর্বত্রই যে প্রত্যক্ষে এসে কৃপা করছেন এমন নয়। অনেক সময় এমন ঘটনাও ঘটে গেছে যেখানে তাঁর উপস্থিতির কোনো চিহ্ন অনুভব করা যায় নি। কখনো আবার কৃপার বহর দেখে বিরক্ত না হয়ে পারি নি। তখন মনেই হয় নি যে তিনি কৃপা করার জন্যই এমন অস্বস্তিকর অবস্থায় বা দুর্বিপাকের মধ্যে ফেলেছেন। কখনো এমনও হয়েছে যে, তাঁকে স্মরণ করাই হয় নি অথচ তিনি কৃপা করে গেছেন। শেষের কথায় কেদারনাথ নিয়ে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল।

একসময় বাবা আর দাদা গিয়েছিলেন শ্রীকেদারনাথ দর্শন করতে। দাদার ছবি তোলার খুব নেশা। যেখানে যেমন পারেন ছবি তুলে বেড়ান। কেদারনাথ দর্শনে গিয়ে চারিদিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি ছবি তুলে বেড়াচ্ছেন। একটা ছবি যতক্ষণ না তাঁর ফ্রেমে সন্তুষ্টজনক হয়, ততক্ষণই তিনি নানাদিক থেকে ক্যামেরা সরিয়ে ঘুরিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে দেখেন। এমনভাবে ছবি তুলতে তুলতে একসময় এমনই বেখেয়াল হয়ে গেছেন যে কোথায় আছেন, কোথায় পা রেখেছেন, সেটাও নজর করেন নি। হঠাৎই কেউ যেন পিছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সামনে দিকে ঠেলে দিলেন। হুমড়ি খেয়ে সামনে দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে যা দেখলেন, তাতে রক্ত হিম হয়ে যাবারই অবস্থা। ছবির ফ্রেম ঠিক করার জন্যে পিছতে পিছতে একেবারে কিনারায় তিনি যে পাথরটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেটা খসে গিয়ে খাদে পড়ছে। যেখানে তিনি পা রেখেছিলেন, তারপরে আর কোনো জমি ছিল না, শুধু অতল খাদ। কে তাঁকে ওই সময় ধাক্কা দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে দিলেন! ওই তো তিনি, ওই তো তাঁর কৃপা।

ওই ঘটনার প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের পরের একটি ঘটনার কথায় আসি। যেখানে তাঁর কৃপার প্রথমাংশ ছিল আমাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর। কখনো ভাবতেও পারি নি যে তিনি কৃপা করছেন। বরঞ্চ তাঁকে দোষারোপ করেই ক'দিনের পরিস্থিতি সহ্য করেছি। অথচ, শেষ পর্যায়ে এসে দেখা গেছে, ওই অশান্তিকর অবস্থায় না পড়লে আমাদের আত্যন্তিক সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হত।

কাকিমা আর খুড়তুতো বোনকে নিয়ে আমরা দু'জন হরিদ্বার থেকে শ্রীবদ্রিনাথজী দর্শন অভিলাষে বেরিয়েছিলাম। আমাদের বেড়ানোর তালিকায় সেবার কেদারনাথ দর্শন ছিল না। কিন্তু গুরুমহারাজ তথা শ্রীকেদারনাথের ইচ্ছের কথা কী আমরা জানি!

হরিদ্বার থেকে একটা গাড়ি নিয়ে চললাম শ্রীবদ্রিনাথজীর চরণদর্শন উদ্দেশ্যে। পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে গাড়ি চলতে লাগল। চারিদিকের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ প্রসন্ন মনেই চলেছিলাম। কিন্তু প্রসন্নতা উবে গেল আমাদের ড্রাইভারের অবস্থা দেখে। সে একটা বড় মদের বোতল খুলে তরলটি গলায় ঢালতে ঢালতে গাড়ি চালাচ্ছিল। তাকে বারণ করলে, সে বললো যে, পেটে ওইটা না গেলে সে গাড়ি চালাতে পারবে না। তারপরে শুরু হল তার গানের পালা। সেই গান আমাদের

শুনতে ভালো লাগছে না বলে সে খুব রেগেও যাচ্ছে। সেই সঙ্গে এমন ভাবে গাড়ি চালাচ্ছে যে, কাকিমা আর আমার স্ত্রী দুজনেই বারে বারে বমি করতে করতে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। এই করে যেতে যেতে সন্ধ্যার সময়েও আমরা রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত যেতে পারলাম না। তার আগেই একটা রিসর্টের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সে বললো, 'আর যেতে পারব না। এখানেই রাতে থেকে যাও।'

তখন সেই রিসর্টে রাত কাটানোর জন্যে ঘর নিলাম। রিসর্টের মালিক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, 'এই সিজিনে আপনারাই প্রথম বাঙালি আমার এখানে এলেন।' প্রথম বাঙালি ট্যুরিস্ট হওয়ার সুবাদে তিনি আমাদের থেকে তিন হাজারের জায়গায় এক হাজার টাকা করে ভাড়া নিলেন। তারপর গল্প করতে করতে আমাদের ঘোরার পরিকল্পনা শুনে বললেন, 'এখানে এসেছেন, মাকে নিয়ে এসেছেন, শ্রীকেদারনাথকে দর্শন করবেন না!' বললাম, 'আমাদের তো পরিকল্পনা নেই। তা ছাড়া সেই মতো টাকাও নেই।' বললেন, 'বাবু, টাকা আমি দিচ্ছি। আপনি কলকাতায় ফিরে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার করে দেবেন। এতটা এসে কেদারজীকে দর্শন করবেন না! এখান থেকে একটু এগোলেই ফাটা নামে একটা জায়গা আছে, সেখান থেকে হেলিকপ্টার সার্ভিস আছে। মাকে নিয়ে হেলিকপ্টারে চলে যান।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'কখন বেরোতে হবে?' বললেন, 'ভোর চারটের সময় রওনা হয়ে যাবেন, তা হলেই হবে।' তার সঙ্গে কথা বলে ড্রাইভারের সম্মতি নিয়ে সেই পরিকল্পনাই স্থির করা গেল।

পরের দিন পৌণে চারটের সময় আমরা তৈরী হয়ে ড্রাইভারকে ডাকতে গেলাম। সে তখন আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। কোনো রকমে চোখদুটো খোলার চেষ্টা করতে করতে বললো, 'আমি যেতে পারব না। এখন চালালে গাড়ি ভিড়িয়ে দেব। এখন যেতে পারব না।' এবার কী করি! ইতিমধ্যে রিসর্টের মালিক ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ড্রাইভারের কথা শুনে তিনি ওখানকার একজনকে ডেকে আমাদের রওনা করিয়ে দিলেন।

রিসর্ট থেকে ফাটায় এসে হেলিকপ্টারে চড়ে এগারোটা দশ/ পনেরো নাগাদ কেদারে পৌঁছলাম। পুজো দেবার সময় দেখলাম মন্দিরের মধ্যে কেবল আমরা চারজন আর পুরোহিত। কাকিমা, স্ত্রী আর বোনকে একদিকে, আমাকে তাঁদের থেকে একটু তফাতে রেখে পুজো করাচ্ছেন পুরোহিত - তিনিও বাঙালি। পুজো করার পর, আমাকে পুরোহিত বললেন, 'শ্রীকেদারজীকে স্পর্শ করুন।' আমি হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে গেলাম। তিনি বললেন, 'ওই ভাবে না, এই ভাবে।' বলে কেদারনাথের সঙ্গে আমাকে একেবারে ঠেসে ধরলেন। বললেন, 'দুহাত দিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরুন। ভক্তরা সব বাবাকে সামান্য স্পর্শ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু এই ভাবে এঁকে কেউ পান না। আপনি ভালো করে ধরুন। কোনো তাড়াহুড়ো করবেন না।'

বেশ কিছুক্ষণ ধরে, কেদারনাথজীর সঙ্গে কোলাকুলি সেরে সাড়ে বারোটা নাগাদ মন্দিরের বাইরে এলাম। এবার হেলিকপ্টারে চড়ে নিচে নামব। নিচে নেমে খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে রিসর্টে ফিরব।

হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারগুলো আসছে, ফিরে যাচ্ছে। দেখতে বেশ ভাল লাগছে। আর দুটো হেলিকপ্টার ফিরে যাবার পর আমাদের ফেরার পালা। একটা হেলিকপ্টার এল, ফিরে গেল। তারপরের হেলিকপ্টার আর আসে না। মিনিট দশেক পরেই দেখা গেল মেঘে ঢেকে গেল চারিদিক। সেই সঙ্গে

অসম্ভব ঠাণ্ডা হাওয়া। কী শীত কী শীত। এদিকে ঘন্টা দুতিনের মধ্যে ফিরে আসবে বলে নিচে গাড়িতেই সবার গরম জামাগুলো রেখে আসা হয়েছে। ক্রমে একটা বাজলো, দুটো বাজলো আড়াইটে। খিদেতে পেট কুঁই কুঁই করছে। তখন ওখানেই যে হোটেল মতো ছিল, সেখানে খাওয়া দাওয়া করতে গেলাম। খেতে খেতে বললাম, 'গুরু দর্শনের পর গুরুগৃহে প্রসাদ পেয়ে যেতে হয়। দেখ, গুরুমহারাজ নিশ্চয়ই খাওয়া দাওয়া করিয়ে ছাড়বেন বলেই ধরে রেখেছেন।' কিন্তু অসহায় অবস্থায় আমার কথা কানে যাবে কেন। বাস্তবিক, সেদিন চারভক্তকে শ্রীগুরু মহেশ্বর অভুক্ত অবস্থায় নিজ আলয় থেকে যেতে দেন নি। গুরুমহারাজ যেন ইঙ্গিতে নিজ স্বরূপটি দেখিয়ে দিলেন।

এবারেই ঘটল ম্যাজিক। খেয়ে দেয়ে হাত ধুয়ে হেলি প্যাডে এসে দাঁড়াতেই শুনলাম, 'আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ওপার থেকে একটা হেলিকপ্টার এখুনি ছাড়বে। এইটার পরেরটায় আপনারা যাবেন।' হলও তাই। 'জয় শ্রীশ্রীগুরু কেদারনাথ মহারাজজীর জয়' বলে আমরা পরের হেলিকপ্টার চড়ে নেমে এলাম নিচে।

পরে চিন্তা করে দেখলাম, ওই মাতাল ড্রাইভারটা না জুটলে আমাদের তো শ্রীকেদারনাথের চরণদর্শন স্পর্শন সম্ভবই হত না।

জীবনে এমন ঘটনা বহুবারই ঘটেছে, তাঁর কৃপার বহর দেখে সত্যি সত্যিই প্রথম দিকে বিরক্ত না হয়ে পারি নি।

ক্রমশঃ

(৭১ নম্বর পৃষ্ঠার শেষাংশ) কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার

কিন্তু শেষ পর্যন্ত "অনন্যা ভক্তিকেই" সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলা হয়েছে (৮।২২ ইত্যাদি)।

তাহলে, উদার দৃষ্টিভঙ্গীজাত শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত গীতায় স্বরূপতঃই কোনোপ্রকার সঙ্কীর্ণতা নেই। সেই একই পথে সকলকেই চলতেই হবে বলে জোর করা নেই, বৃথা তর্জন গর্জন নেই। সেজন্যই গীতা ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ বাণী।

শ্রীগুরু কেবলমাত্র যন্ত্র নহেন, তিনিও মানুষ। তিনি নিষ্ক্রিয় মানুষ নহেন, তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্বগঠনের লক্ষ্যে প্রবৃত্ত। তাঁর তাপসজীবনের গতিশীল ধারায় শিষ্যের চিত্তকেও গতিশীল করিয়া তোলাই..... শ্রীগুরুর সাধনার অঙ্গ। তাই শিষ্যও জীবনে প্রেরণা পায় তাঁর (শ্রীগুরুর) অব্যবহিত সঙ্গ হ'তে।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ

মূর্তি পূজার আবশ্যকতা

শ্রীমতী দীপ্তি ব্যানার্জী

পুজো বলতে নান শাস্ত্রগ্রন্থে বা পণ্ডিতগণ নানামত প্রকাশ করেছেন, আবার অনেক গম্ভীর ব্যাখ্যাও আছে। খুব সাধারণভাবে পুজোর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে পুজো হল পন্নাদির দ্বারা দেবতার অর্চনা। পন্ন, পুষ্প নৈবেদ্য দীপাদি অর্পণ - যেটা সবসময়েই করা হয়ে থাকে - তা হলে মূর্তি পুজার আবশ্যকতা কোথায়?

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনেই মূর্তি তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ধর্মের পিপাসা বিভিন্ন - যতদিন প্রতিমা পুজোর প্রয়োজন থাকবে, ততদিন প্রতিমা থাকবেই ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও ধর্মের বিভিন্ন সোপান অবশ্যই থাকবে।

পুজো বা আরাধনার প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ করা -। এই জ্ঞানের নানাভাবে উল্লেখ আছে - কোথাও পরব্রহ্ম স্বরূপিনী মহাশক্তি আবার কোথাও ব্রহ্ম বলা হয়েছে। কোথাও জড় পদার্থ, কোথাও চিন্ময়ী।

এই চিন্ময়ীদেবতাই আরাধ্য। প্রতিমাতে দেবতার আবির্ভাব হতে গেলে চাই সুন্দর প্রতিমা, ভক্তদের ভক্তি ও পুজোর প্রাচুর্যতা -। তাহলেই দেবতা সন্নিহিত হন - এটাই বিশ্বাস বা প্রচলিত, আর সেখানেই মূর্তিপুজোর আবশ্যকতা।

এখনকার যুগ প্রমাণ সাপেক্ষের যুগ; চোখের সামনে না থাকলে আমরা বিশ্বাস করতে চাইনা, তাই আমাদের প্রমাণ দরকার।

এই কর্মব্যস্ততার যুগে কারোরই সময় নেই জ্ঞান বা বিশ্বাস বা ভক্তি নিয়ে আলোচনা করার। মানুষ আনন্দ খোঁজে, - আমরা মা আনন্দময়ীকে দেখে আনন্দ পাই - সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দ পাই। এখনকার যুগে যোগাযোগের সূত্র বড় একটা পাওয়া যায় না, সময় একটা বড় factor, তবুও সকলেই এই সময়ে চেষ্টা করেন কিছুটা সময় বার করতে - একবার মায়ের দর্শন পেতে।

বাংলার বাইরে, ভরতের বাইরে - দেশ বিদেশ ছাপিয়ে মায়ের আগমণের প্রস্তুতি চলছে।

মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা -
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

দুর্গাপুজো হল মহামিলনক্ষেত্র, যেখানে কেন্দ্র মা দুর্গা - তাঁকে কেন্দ্র করে আনন্দের ধারা, তাঁকে যদি আমরা সামনে দর্শন না পাই তাহলে অন্তরে কী সেই আনন্দের স্রোত আসবে? তাই মূর্তিপুজোর

প্রয়োজন আজও আছে - মা অনন্দময়ী আসছেন, সকলকে নিশ্চই আনন্দ দেবেন, যে যেভাবে তা গ্রহণ করতে পারবে।-

সকলের মঙ্গল হোক, সকলে নিরাময় হোন,

সকলে সর্বত্র শোভন বস্তু দর্শন করুন,

পৃথিবীতে কেউ যেন দুঃখী না থাকে।।

এই প্রার্থনা যত আন্তরিক হবে, তত সুদূর প্রসারিত হবে মাতৃপুজোর আরাধনা -

সকলকে আমার শারদশুভেচ্ছা জানাই। সকল কর্মীবৃন্দ যাঁরা মা'র সেবায় নিযুক্ত আছেন, মা তাঁদের শক্তি দেবেন তাঁর কাজ সম্পন্ন করার -

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা,

নমঃ তস্যৈ নমঃ তস্যৈ, নমঃ তস্যৈ নমঃ নমো।"

-(চণ্ডী)

হে দেবী আপনি জগৎ পালন করুন,

পরিপালয়ে দেবী বিশ্বম্।।

"যেমন সূত্রাবলম্বনে আমরা আকাশে বহুদূরে পতঙ্গ উড়াইয়া থাকি, তথাপি সেই সূত্রদ্বারা তাহার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারি, সেইরূপই অব্যক্তভাবাকার ব্যাপক বিভু ভগবানকেও আমরা তাঁর প্রিয় মান দ্বারা আমাদের মনের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে ও চিত্তবৃত্তির সঙ্গে নিত্য সংযোগ করিতে পারি। নামের অখণ্ড অনাহত স্পন্দন রসনা দ্বারা উচ্চারিত হইতে হইতে অবশেষে ভাবে গিয়া পরিণত হয় এবং সেই ভাবসমাহিত মন চৈতন্যে বা আত্মায় বা ভগবানের ইষ্টদেবতায় লীন হইলেই এই নাম-নামীর অভিন্নতা উপলব্ধি হইতে পারে।"

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী

পুজো সম্বন্ধে কিছু কথা (পর্ব -১)

শ্রীসোমনাথ সরকার

বাঙালী হিন্দুর জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণ। দোল দুর্গোৎসব থেকে শুরু করে গৃহস্থ বাড়ীর সরস্বতী পুজো, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, দৈনন্দিন নিত্য পুজোয় পঞ্জিকার সারা বছরের প্রতিটা দিন ভরে আছে। তার মধ্যে বড় বড় মূর্তি পুজো, যেমন দুর্গাপুজো, কালী পুজো জগদ্ধাত্রী পুজোর ক্ষেত্রে পাঁচটি প্রধান অঙ্গ (১) কল্পারম্ভ (২) বোধন (৩) আবাহন ও অধিবাস (৪) প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও পুজো (৫) বিসর্জন।

আর বাড়ীতে সরস্বতী পুজো লক্ষ্মী পুজোর ক্ষেত্রে নিয়ম কিছু সংক্ষিপ্ত হয়।

(১) কল্পারম্ভ - যে কোনো কাজ আরম্ভ করার আগে কাজটির সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা মনে মনে ছকে নিয়ে, কাজটা করার ব্যাপারে একটা প্রতিজ্ঞা বা সংকল্প করে নেওয়া হয়।

আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানের সংকল্পও আলাদা আলাদা। আবার পুজোর সংকল্প ও গ্রহশান্তির ভাষা ও কিছুটা আলাদা হয়। আবার ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সংকল্প গ্রহণের ভাষাও কিছুটা আলাদা, যদিও মুল ভাবটা একই।

একটা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক।

হস্তে তাম্রপাত্রে কুশ, তিল, বিল্বপত্র, হরীতকী, পুষ্প ও গঙ্গাজল নিয়ে বাম হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বলতে হয়, অথহঃ সংকল্পহঃ

নমঃ বিষ্ণু, নমঃ বিষ্ণু, নমঃ বিষ্ণু

শ্রীমদ্‌ভগবতো মহাপুরুষস্য বিষ্ণুর্আজ্ঞায়া প্রবর্তমানস্য অদ্য পরব্রহ্মণ দ্বিতীয় পরার্ধে, শ্রী শ্বেতবরাহ কল্পে, বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তমে, অষ্টাবিংশতি তমে যুগে, কলিযুগে, কলি প্রথম চরণে, ভুর্লোকে, জম্বুদ্বীপে, ভারতখণ্ডে, আর্যাবর্তান্তর গত ব্রহ্মবর্তৈক দেশে ভারতবর্ষে, অমুক প্রদেশে, গঙ্গায়াং পূর্ব/পশ্চিম তটে, অমুক নগরে/গ্রামে অন্তর্গত অমুক স্থানে মম স্বগৃহে/আশ্রমে উত্তর/দক্ষিণ অয়নে অমুক ঋতৌ, অমুক মাসে, শুক্ল/কৃষ্ণ পক্ষে, অমুক তিথৌ, অমুক বাসরে, ভাস্করে, অমুক রাশিস্থে অমুক গোত্র উৎপন্ন অহম্ শ্রী অমুক নাম আত্মনং সপরিবারস্য শ্রী অমুক দেবতা/দেবী প্রীতকাম পূজন সংকল্পে শ্রী গণেশাদি পঞ্চদেবতা পূজা পূর্বকম শ্রী অমুক দেব/দেবী পূজন সংকল্প কর্ম্মাহং করিষ্যে। ওঁ সংকল্পিতার্থা সিদ্ধাঃ সন্তু মনোরথাঃ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

বলে হস্তস্থিত পাত্র ঈশান (উত্তর পূর্ব) কোণে উপুড় করে দিতে হয়।

আবার এটাই যখন কোনো গ্রহশান্তি উদ্দেশ্যে পুজো হবে তখন উপরিউক্ত সংকল্পের সাথে কিছু কিছু কথা যুক্ত করেন যিনি গ্রহশান্তির পুজো করান।

যেমন - "অমুক গোত্রৎপন্নম্ অহম্ মম আত্মনহ শ্রুতি স্মৃতি পুরানোক্ত পুণ্যফল প্রাপ্তি অর্থম, প্রাপ্তলক্ষ্মী চিরকাল সংরক্ষনার্থম্, সকল মন ঈপ্সিত কামনাসু সিদ্ধি অর্থম্, সর্বত্র যশ, বিজয় প্রাপ্তি

অর্থম্ , ত্রিবিধ তাপ উপসমনার্থম্ , জন্মকুণ্ডলি অন্তর্গত গ্রহদোষ নিবারণার্থম্ , নবগ্রহ অনুকূলতা অর্থম্ ভগবান মহামৃত্যুঞ্জয় মহারুদ্র প্রসন্নতা অর্থে অভিষেকম্ অহম্ করিষ্যে -- ইত্যাদি।

এই ভাবে বিভিন্ন কার্যের সংকল্প বিভিন্ন। অবশ্য গৃহস্থ গৃহে যে সাধারণ পুরোহিত মশাইরা পুজো করান, তাঁরা এত কিছু না বলে অতি সংক্ষেপে সংকল্প করে নেন।

এবারে সংকল্পে বলা কিছু কিছু কথার অর্থ আলোচনা করে নেওয়া যাক।

''ভগবান শ্রী হরিকে স্মরণ করে শ্রী পরমেশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য আমি অমুক গোত্রের অমুক নাম, বর্তমান ব্রহ্মার দ্বিতীয় পরার্ধে, (বর্তমান ব্রহ্মার জীবনের দ্বিতীয় ৫০ বছরের প্রথম ভাগে, ৫১ তম বর্ষের প্রথম দিন। এই পরার্ধের নাম শ্বেত বরাহ কল্প। মনে রাখতে হবে, ব্রহ্মার জীবনের বছরের সঙ্গে মানুষের জীবনের বছর মেলে না।) মার্কেণ্ডয় পুরাণ অনুসারে এই কল্পের ১৪ মন্বন্তরের মধ্যে ৬টি মন্বন্তর পার হয়েছে। এটি সপ্তম মন্বন্তর। নাম বৈবস্বত মন্বন্তর।

আমরা শ্রীমদ্ভগবদগীতার জ্ঞান যোগ অধ্যায়ে দেখেছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই যোগ বিবস্বান অর্থাৎ সূর্যদেবকে বলেছিলেন। সূর্য আবার এই যোগ তাঁর পুত্র মনুকে বলেছিলেন।

আমরা জানি পৃথিবীর সকল জীব সূর্যের থেকেই সৃষ্ট। আবার মনু থেকেই মানব জাতির সৃষ্টি।

এই মন্বন্তরের ২৭টি মহাযুগ পার হয়ে বর্তমানে ২৮তম মহাযুগের সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর পার হয়ে এখন কলিযুগ চলছে।

এবার দেখুন অদ্যব্রহ্মণঃ অর্থাৎ বর্তমান ব্রহ্মার সময়কালে, দ্বিতীয় পরার্ধে অর্থাৎ ৫০ বছর পরে (৫১ তম বর্ষে) শ্রীশ্বেত বরাহ কল্পে বৈবস্বত মনুর সময় কালে, ২৮তম মহাযুগের কলিযুগে, কলি প্রথম চরণে, মানে কলিযুগের প্রথম ভাগে -

আমরা জানি শ্রীবিষ্ণু বরাহ অবতারের বেশ ধারণ করে দৈত্য হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাকে বধ করে, বর্তমান পৃথিবীকে মহাজাগতিক সমুদ্রের তলা থেকে উদ্ধার করেন। এই কল্পের নাম শ্রীবিষ্ণুর সেই অবতারের নাম অনুসারে।

মনে রাখ তে হবে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডই একমাত্র ব্রহ্মাণ্ড নয়। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের একজন করে ব্রহ্মা আছেন। তেমনি অসংখ্য মনুও আছেন। ব্রহ্মার জন্ম আছে, মৃত্যুও আছে। তেমনি মনুরও জন্ম মৃত্যু আছে।

তাই আমরা যখন কোনো দেবতাকে আহ্বান করি তখন অসীম (Infinite) সময়ের ঠিক কোন সময়ে, কোন যুগের কোন ক্ষণে, কোন ব্রহ্মাণ্ডের কোন অঞ্চলে আহ্বান করছি তা সঠিকরূপে প্রকাশ করা দরকার। তাই সংকল্পের মধ্যে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলেই এত ভেঙে ভেঙে সংকল্প বাক্য বলতে হয়।

মুল কথা হল আমি এই বিশেষ স্থানে বসে, এই বিশেষ সময়ে অমুক দেবতার পুজো করছি। হে ভগবান আমার পুজো গৃহীত হোক। বেশ কযেক বছর আগের কথা মনে করুন। শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী

দুর্গা পুজো লক্ষ্মী পুজো ইত্যাদি করে বিদেশ যেতেন। আবার শীতকালে ফিরে আসতেন। এবার শীতকালে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী যখন দেশে আসবেন, আপনি তখন গৃহে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে চান। আপনি তখন বিদেশে তাঁকে চিঠি লিখলেন সেই বাসনা জানিয়ে এবং আপনার গৃহের অবস্থান জানিয়ে।

আপনি আপনার নাম, গৃহের নম্বর, রাস্তার নাম, অঞ্চলের নাম, শহর বা গ্রামের নাম, প্রদেশের নাম, পিন কোড এবং দেশের (India) নাম ঠিকানা লিখে বুঝিয়ে দিলেন, আপনি কোথায় থাকেন।

এবার একটা কথা পাচ্ছি জম্বুদ্বীপে - শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির পৌরাণিক উপাখ্যান, বিষ্ণুপুরাণ, এবং শ্রীমদ্‌ভগবতের তৃতীয় স্কন্ধের থেকে আমরা জানতে পারি পূর্বে সমগ্র পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে Asia Continent বা এশিয়া মহাদেশকে বলা হত জম্বুদ্বীপ। আর Indian sub Continent কে বলা হত ভারতখণ্ড, (ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, আফগানিস্থান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ নিয়ে ছিল এই অংশ।)

মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। আর প্রিয়ব্রতের প্রপৌত্র রাজা ভরত এর নাম অনুসারে ভারতবর্ষ।

আমরা জানি সারা বছরকে দুইটি অয়ণে ভাগ করা হয়েছে। অয়ণ অর্থাৎ সূর্যের চলন।

উত্তরায়ণ - বিষুবরেখা থেকে সূর্যের ক্রমশঃ উত্তরে চলন (২২শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে জুন) আর দক্ষিণায়ণ - বিষুবরেখা থেকে সূর্যের ক্রমশঃ দক্ষিণে গমন (২২শে জুন থেকে ২১ ডিসেম্বর)। ছয় ঋতুর মধ্যে কোন ঋতুতে সংকল্প করছি আমরা।

তিথি - আমরা জানি শুক্লপক্ষে ১। প্রতিপদ থেকে শুরু করে পূর্ণিমা পর্যন্ত ১৫টি তিথি, আবার কৃষ্ণপক্ষে ১৬। প্রতিপদ থেকে শুরু করে অমাবস্যা পর্যন্ত বাকী ১৫টি মোট ৩০টি তিথি। এবারে বলা হচ্ছে সপ্তাহের কোন বারে আমরা সংকল্প করছি। শাস্ত্র মতে বারকে বলা হয় বাসর।

১। রবিবার - ভানুবাসর ২। সোমবার - ইন্দুবাসর ৩। মঙ্গলবার - ভৌমবাসর
৪। বুধবার - সৌম্যবাসর ৫। বৃহস্পতিবার - গুরুবাসর ৬। শুক্রবার - শুক্রবাসর
৭। শনিবার - শনিবাসর।

কোন বারে পুজো করা হচ্ছে, তার ঠিক পরেই একটা কথা আছে - ভাস্করে অমুক রাশিস্থে।

সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী পুরো একটা পাক ঘোরে ১ বছরে ৩৬০°। আর এই কক্ষপথ ৩০° করে মোট ১২টা ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটা এক মাসের নাম দেওয়া হয়েছে আর প্রত্যেক মাসের এক একটা রাশি আছে।

১। বৈশাখ - মেষ রাশি ২। জ্যৈষ্ঠ - বৃষ রাশি ৩। আষাঢ় - মিথুন রাশি
৪। শ্রাবণ - কর্কট রাশি ৫। ভাদ্র - সিংহ রাশি ৬। আশ্বিন - কন্যা রাশি
৭। কার্তিক - তুলা ৮। অগ্রহায়ণ - বৃশ্চিক ৯। পৌষ - ধনু
১০। মাঘ - মকর ১১। ফাল্গুন - কুম্ভ ১২। চৈত্র - মীন।

এবার ধরে নেওয়া যাক কার্ত্তিক মাসে শনিবারে দীপান্বিতা কালি পুজোর সংকল্পের সময় বলা

হবে -..... দক্ষিনায়ণে, হেমন্ত ঋতৌ, কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা তিথৌ শনি বাসরে ভাস্করে তুলা রাশিস্থে ইত্যাদি ইত্যাদি -

বোধন - বোধন অর্থাৎ জাগরিত করা। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা দেখেছি, কারণ সমুদ্রে অনন্তনাগের উপর শ্রীবিষ্ণু যোগনিদ্রায় শায়িত। শ্রীবিষ্ণুর নাভী থেকে উৎপন্ন কমলের উপর বসে প্রজাপতি ব্রহ্মা, সৃষ্টির ধ্যানে মগ্ন। বিষ্ণুর কর্ণমল (জড় বস্তু) থেকে উৎপন্ন দুই দৈত্য মধু ও কৈটভ (অশুভ শক্তি) ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, ব্রহ্মা শ্রীবিষ্ণুকে জাগরিত করে মধু ও কৈটভের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে প্রার্থনা করবেন। কিন্তু মহামায়ার মায়ার প্রভাবে শ্রীবিষ্ণু নিদ্রামগ্ন। তাই ব্রহ্মা মহামায়াকে স্তব দ্বারা বোধন করলেন। মা ব্রহ্মার স্তবে প্রসন্ন হয়ে শ্রীবিষ্ণুকে জাগরিত করলেন। শ্রীবিষ্ণু মধু ও কৈটভকে হত্যা করলেন।

সাধকের অন্তরের জড় প্রকৃতি (মধু ও কৈটভ) সাধককে সাধনায় (ব্রহ্মা) অগ্রসর হতে বাধা দেয়। সাধকের অন্তরের সাত্ত্বিক প্রকৃতিকে (বিষ্ণু) ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে তামসিক (মহামায়া) প্রকৃতি।

তাই বোধনের অর্থ মৃন্ময়ী মূর্তিকে বোধনের স্তব ও পুজোর মাধ্যমে চিন্ময়ী দেবীতে জাগরিত করে সাধকের পুজো গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রার্থনা করা।

আমন্ত্রণ ও অধিবাস বোধনের ফলে মা জাগরিত হলেন। তখন তাঁর মধ্যে অপূর্ব দেবীরূপ ফুটে উঠল। আকাশে, বাতাসে, মাটিতে সর্বত্র মায়ের রূপ ধরা দিল।

অধিবাস হল সংকল্পিত পুজো ও উৎসবের পূর্বদিনে পালিত প্রস্তুতির অংশ।

(মহানির্বাণ তন্ত্র ১৪.২৪-২৭) এ বলা হয়েছে মহী (পৃথিবী), গন্ধঃ, শিলা, ধান্য ইত্যাদি বিংশতি প্রকার দ্রব্য দিয়ে মাকে অধিবাস করে আমন্ত্রণ করা হয়।

দুর্গা পুজোয় অধিবাসের এই পদ্ধতি সাধারণত ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বোধনের কালে বিল্ব বৃক্ষ তলায় করা হয়।

পুজোয় বাকী তিন অংশ প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পুজো ও বিসর্জন। প্রতিমা পুজোয় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হয় মন্ত্র বলে। আমরা শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীকে দুর্গা পুজো, কালীপুজো, লক্ষ্মী বা জগদ্ধাত্রী পুজোর সময় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে দেখেছি।

গৃহে নিত্য পুজোয় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপার নেই। ঠিক তেমনি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমারও নিত্য পুজোয় প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না।

"ওগো মন্দিরে যত পাষাণ দেবতা
তাদের রয়েছে প্রাণ,
প্রাণহীন মোরা, তাই তো মানি না
নাহি জানি ভগবান।।"

পুজোর বাকী নিয়মকানুনের কথা পরের পর্বে।। জয় গুরুমহারাজ

ক্রমশঃ

শ্বেতকালী, মাতা রাজবল্লভী

শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়

শুভ শারদীয়ায় শ্রীশ্রীগুরুচরণে জানাই অন্তরের প্রণাম। বাংলাদেশে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য আকাশে বাতাসে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তেমনি এক দেবী মাহাত্ম্যের কাহিনী তথ্যানুযায়ী শারদীয়ায় এখানে জানাতে চাই। প্রথম অধ্যায় -

প্রাচীনকালে ভুরসুট পরগণা ছিল এক সমৃদ্ধ সামন্ত রাজ্য। হুগলী, হাওড়া মেদনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছিল ভুরসুট রাজ্য। দামোদরের দুই-তিন মাইল পূর্বে শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত জাঙ্গীপাড়া থানার একটি গ্রাম, 'দিল আকাশ'। এই 'দিল আকাশ' গ্রামে 'দশবল চণ্ডভামর নামে এক বাগদী সর্দার বাস করতেন। তাঁর কাপালিক গুরুর সহায়তায় সর্দার ভুরসুট পরগণার বহু অঞ্চল নিজ বাহুবলে অধিকার করে নিজেকে রাজা বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি ভীষণাকৃতি এক কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবী ডাকাত কালী নামে খ্যাত। প্রতি অমাবস্যায় এখানে নরবলি হত। বাগদী সর্দার এক কুখ্যাত অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী ডাকাত ছিলেন। তার উত্তরপুরুষ 'শনি ভাঙ্গর'ও যথারীতি অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী ছিলেন। এই লুণ্ঠন করেই রাজকোষ পরিপূর্ণ হত। দিল্লীর সম্রাটের অনুশাসন অগ্রাহ্য করেই এইসব আঞ্চলিক রাজাগণ স্বীয় বাহুবলে নিজ নিজ অঞ্চল শাসন করতেন। রাজা শনিভাঙ্গরের অনুচরগণ একদিন ভাগীরথী তীরে এক ব্রাহ্মণ কিশোরকে অপহরণ করে রাজার হাতে অর্পণ করে। রাজা সেই বালককে গুরুদেবের কাছে নিয়ে গিয়ে বলিদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু গুরুদেব ওই বালকের ললাটে সর্বসুলক্ষণ রাজটীকা দেখে রাজাকে এই নরবলী হতে নিবৃত্ত করেন। অতঃপর এই কুমার রাজগুরুর শিক্ষায় সর্বশাস্ত্রেও রাজনীতিতে সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। ক্রমে শনিভাঙ্গরের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে বাগদী রাজার সেনাপতি হয়ে ওঠেন। কুমারের নাম ছিল 'চতুরানন নিয়োগী।' পরবর্তীকালে চতুরানন ভুরসুট পরগণার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজা চতুরাননের একটি মাত্র কন্যা সন্তান। কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় জামাতা সদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেন। ইতিমধ্যে জামাতাকে রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন।

রাজপদে অভিষিক্ত হয়ে রাজা সদানন্দ 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেন। রাজা সদানন্দ ছিলেন ধার্মিক, প্রজাবৎসল, উদারচেতা উচ্চশিক্ষিত কর্মযোগী। তাঁর রাজত্বের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনি বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকাজের উপযুক্ত জমি তৈরী করেন। ফুলিয়া থেকে বহু তন্তুবায় এনে ভুরসুট পরগণায় বসতি করান। সেই সময় রাজবলহাট, গড়-ভবানীপুর, আমতা, উলুবেড়িয়া তমলুক প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। তাঁর রাজ্যে উৎপন্ন কৃষিজদ্রব্য ও সূতিবস্ত্র এই সব বন্দর মারফৎ ভারতের বিভিন্ন বাজারে প্রেরিত হয়। তিনি রাজবলহাট, কৃষ্ণনগর, আঁটপুর, আটঘড়া, ধনিয়াখালি প্রভৃতি গ্রামে তাঁত শিল্পীদের বসতি করান।

একদা রাজবলহাটে রাজা শিকারে যান এবং অনেক হরিণ শূকর শিকার করেন। কিন্তু পশু বধ করে তাঁর খুব অনুশোচনা হয়। অনুতপ্ত হয়ে পদচারণা করতে করতে দামোদর তটে উপস্থিত রাজা সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করেন। তখন সূর্যের শেষ রক্তিম আভায় দামোদরের জল টলমল করছে। রাজার মনে অদ্ভূত এক ভাবান্তর ঘটল। ব্রাহ্মণ হয়ে তিনি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় প্রাণী হত্যায় পাপকাজ করেছেন, এই ভেবে তিনি তাঁর গুরুদেবের নিকট রাজকার্য পরিত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু

গুরুদেব তাঁকে রাজকার্যে নিবৃত্ত হতে নিষেধ করেন। বলেন, প্রজামঙ্গলের জন্য জনহিতকর কাজ করতে, ধর্মে কর্মে মনোনিবেশ করতে, তবেই মানসিক গ্লানি থেকে মুক্ত হবেন। গুরুদেব তাঁকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেন এবং রাজা শব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

কিংবদন্তী এই যে - যখন মা রাজবল্লভীর প্রতিষ্ঠা হয় নি, তখন রাজা সদানন্দ গুরুর নির্দেশে মৃগয়া ক্ষেত্রে যে স্থানে তাঁর রাজকার্য্যে বীতরাগ হয়েছিল সেই বনমধ্যে শব সাধনায় ব্রতী হলেন। তখন একদা এক দেবীমূর্তি আর্বিভূতা হন। শরৎকালীন জ্যোৎস্নার ন্যায় দেবীর গাত্রবর্ণ। দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, সম্মুখে বাম হস্ত প্রসারিত - তাতে রুধির পাত্র। কোটি দেশে মুণ্ডমালা। পদপ্রান্তে শায়িত কালভৈরবের বক্ষস্থলে দেবীর দক্ষিণ পদ এবং বামপদ দেবীর পদতলে উপবিষ্ট বিরুপাক্ষের মস্তক স্পর্শ করে আছে। ত্রিনয়না দেবীর মুখমণ্ডল স্মিত হাস্যে উদ্ভাসিত। বরাভয়দায়িনী ষোড়শী মূর্তিতে দেবী আর্বিভূতা হয়ে রাজাকে প্রত্যাদেশ দিলেন - " এই ভূখণ্ডে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করো এবং সর্বদাই তোমার কৃতকার্য্যে সফল হও", ইনি হলেন দেবী "রাজবল্লভী"। দেবী গঙ্গা মৃত্তিকায় নির্মিতা। দেবীর আবির্ভাব নিয়ে অন্যান্য কাহিনী প্রচলিত থাকলেও তার ঐতিহাসিক কোনো সত্যতা নেই।

রাজা সদানন্দ দেবীর প্রতিষ্ঠা করে গ্রামের নাম দেন - 'রাজবল্লভী হাট', কালক্রমে তা রাজবলহাট নামে পরিচিত হয়। রাজা দেবীর পুজো ভোগ সেবার জন্য নদীয়া জেলা হতে বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাহ ও পালধি উপাধিধারী তিনজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আনয়ন করে দেবীর পূজার ভার অর্পণ করেন। স্বাহ পরিবার কালক্রমে স্বাবর্ণ চৌধুরী ও পরবর্তীকালে সাহা চৌধুরীতে রূপান্তরিত হয়। শিয়াখালা গ্রামে দেবী উত্তরবাহিনীর মন্দির। কথিত আছে, দেবী-উত্তর বাহিনী মা রাজবল্লভীর সহোদরা। দুই দেবীর মূর্তি একই রূপে বিরাজিতা।

নিত্য নতুন মাটির হাঁড়িতে দেবীর অন্নভোগ পাকের জন্য রাজা সদানন্দ গ্রামের পশ্চিম দিকে কুম্ভকার সম্প্রদায়ের বসতি করান। মধ্যাহ্ন ভোগের পরমান্ন, নিত্য পুজোর দুগ্ধ, ও দেবীর সন্ধ্যারতিতে ছানার প্রয়োজন হেতু গ্রামে উত্তর প্রান্তে গোয়ালাদের বসতি করান। নিত্য মৎস্য ভোগের জন্য রাজা বৃহৎ দীঘি খনন করিয়ে গ্রামের পূর্ব প্রান্তে জেলে সম্প্রদায়ের বসতি করান। আর মায়ের মালঞ্চের মালাকার সম্প্রদায়কে সরস্বতী নদীর উত্তর প্রান্তে বসতি করান। ব্রাহ্মণ, তন্তুবায়, কুম্ভকার, মালাকার, কর্মকার সম্প্রদায় সকলকে রাজা প্রভূত ভূসম্পত্তি দান করেন। দেবী মন্দির ও জনপদ রক্ষার্থে রাজা মন্দিরের অদূরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন।

মন্দিরসম্মুখে নাটমন্দির, শিবমন্দির, নহবৎখানা, অন্দরবাড়ীতে নিত্য অন্নভোগের জন্য রন্ধনশালা নির্মাণ করেন। যাত্রী ও ভক্তদের স্নানের জন্য মন্দির সম্মুখে রাজা বৃহৎ পুষ্করিনী খনন করেন। জনশ্রুতি - দেবী -রাজবল্লভী প্রত্যহ প্রত্যুষে এই পুষ্করিণীতে স্নান করেন। দেবীর অহৈতুক কৃপা - ঘুসঘুসে জ্বরে আক্রান্ত রুগীরা ঊষাকালে তিনদিন মায়ের পুষ্করিণীতে ডুব দিলে রোগ মুক্তি ঘটে। তাছাড়া - রক্ত আমাশা, অর্শ, ও পেটের অসুখের মাতৃপ্রদত্ত যে দৈব ওষুধ মন্দির থেকে দেওয়া হয় তা একেবারে অব্যর্থ। কাটা-পোড়া ঘায়ে মাতৃপ্রদত্ত যে তেলপড়া লাগানো হয় তা খুবই ফলপ্রদ দৈব ওষুধ। শিশুদের নানারকম অসুখের জন্য মানত করা যায়। যে সমস্ত শিশুর বোল ফোটে না তাদের জন্য 'ওল' মানত করার বিধি আছে। বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনায় মালাকার মহাশয় দৈব কবচ প্রদান করেন।

পরবর্তী অংশ ৮৪পৃষ্ঠায়

MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY

Rangamati Path, Bidhannagar, Durgapur-713212, West Bengal

A DEDICATED CANCER HOSPITAL

LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 23/02/2023 to 10/08/2023)

DATE	RT. NO.	NAME AMOUNT	(RS.)
03-03-2023	1489	A WELL WISHER, KOLKATA	1,001
03-03-2023	1491	ACHYUTA NARAYAN BANERJEE, KOLKATA	5,001
09-03-2023	1566	BARNALI BANERJEE, KOLKATA	25,000
14-03-2023	1516	ORIENT STEEL INDUSTRIES, BARNPUR	2,000
18-03-2023	1514	MINATI HAZRA, ANDAL	2,500
23-03-2023	1558	BARUN CHANDA	40,000
23-03-2023	1559	TIAS MONDAL, ICHAPUR NAWAB GANJ, DIST:24 PARGANA (N),WB-743144	10,000
28-03-2023	1515	PIYASI BANERJEE & PRIYANSH SAMANTA, KALNA	500
11-04-2023	1490	A WELL WISHER, KOLKATA	1,001
13-04-2023	1492	NAMITA MITRA, KOLKATA	10,001
13-04-2023	1493	BIJALI SENGUPTA, KOLKATA	600
17-04-2023	1560	MONOJIT GANGULY,Flat no: F-04;3rd Floor;R.B Towen,ASANSOL:713304	15,000
24-04-2023	1494	DISCIPLE[DUM DUM PARK] KOLKATA	501
06-05-2023	1517	MANASI BANERJEE, SHYAMPUR, DURGAPUR-01	502
16-05-2023	1561	RATNA CHATTERJEE	49,000
18-05-2023	1495	A WELL WISHER, SALTLAKE OFFICE	5,001
20-05-2023	1496	SABITA BISWAS, SALTLAKE OFFICE	1,001
20-05-2023	1497	ANJANA BHATTACHARYA, SALTLAKE OFFICE	2,001
20-05-2023	1498	SUDEB BRAHMACHARI, SALTLAKE OFFICE	500
25-05-2023	1562	A WELL WISHER & DESCIPLE OF GURU MAHARAJ	25,000
20-06-2023	1499	A WELL WISHER	1001
03-07-2023	1576	ASHIS SENGUPTA	500
07-07-2023	1500	A WELL WISHER	1001
08-07-2023	1519	MINATI HAZRA, ANDAL	1,500
24-07-2023	1567	RASHMI PATRA	15,847
02-08-2023	1564	A WELL WISHER, ASANSOL	1,000
04-08-2023	1518	A WELL WISHER	1700
10-08-2023	1565	PIJUCE KANTI BANDOPADHYAY & MANASI BANERJEE, SHYAMPUR,DURGAPUR-01	5,001

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রী শঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

PLEASE SEND YOUR DONATION :-

For Donation in Indian Rupees :
Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY.**
Name of the Bank : **STATE BANK OF INDIA,MUCHIPARA BRANCH,** DURGAPUR-713212, BURDWAN, WEST BENGAL. **ACCOUNT NO. 35626526750, BRANCH CODE: 6888, IFS CODE: SBIN0006888.**

For Donation in Foreign Currency :
Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY.**
Name of the Bank **STATE BANK OF INDIA**, 11, SANSAD MARG, NEW DELHI -110001, BRANCH CODE: 00691
ACCOUNT NO. 40283076692
SWIFT CODE : SBININBB104, IFS CODE : SBIN0000691, Account Type : FCRA (Savings).

---

৮২ পৃষ্ঠার পর শ্বেতকালী মাতা রাজবল্লভী

১২/১৪ বছর অন্তর দেবীর নব কলেবর হয়। শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় নব-কলেবর অনুষ্ঠিত হয় ও অন্নকুট হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় - রাজা সদানন্দের জ্যৈষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ সপরিবারে গড়ভবানীপুরে বসবাস করেন এবং রাজপরিবারের রীতি অনুযায়ী রাজ সিংহাসন লাভ করেন। রাজা রুদ্রনারায়ণ হলেন রাজা কৃষ্ণনারায়ণের সপ্তম প্রজন্ম। রুদ্রনারায়ণ আমতা গ্রামের অদূরে কাট্‌সাকড়া গ্রামে গুরুর উপদেশে এক শিব মন্দির স্থাপন করেন। নৌকোয় কাট্‌শাড়া মন্দিরে যাচ্ছেন, এমন কুলাকাশ জঙ্গলে এক অভিনব ও নজরবিহীন ঘটনা দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলেন। দেখলেন, অশ্বারূঢ়া মহাশক্তিরূপিনী পুরুষ যোদ্ধার বেশে সজ্জিতা গৌরবর্ণা সুন্দরী এক কিশোরী। সম্ভবত সেই দেবী স্বরূপা রমনী মৃগয়া করতে একাকিনী অশ্বপৃষ্ঠে এই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করছেন। ওই রমণী অশ্বপৃষ্ঠ হতে বর্শা নিক্ষেপ করে এক হরিণ বধ করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে রোন নদী হতে তিনটি ভীষণাকার বন্য মহিষ রমণীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। রমণী তৎক্ষনাৎ হরিণ বিদ্ধ বর্শাটি নিষ্কাশিত করে প্রথম মহিষটির মস্তকে বিদ্ধ করলেন। ঠিক একই ভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহিষটিকেও বর্শা বিদ্ধ করলেন। রাজা সমগ্র দৃশ্যটি অবলোকন করে নদী তটে অবতরণ করে সেই রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, রমণী রাজা রুদ্রনারায়ণেরই পাঁড়ুয়া দুর্গের সেনাপতি ব্রাহ্মণ দীননাথ চৌধুরীর কন্যা। রাজা দ্রুত কাটশাঁকড়া শিবমন্দিরে গমন করে দীননাথের কাছে দূত পাঠালেন। দীননাথের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে রাজা জানতে পারেন কন্যা এখনো অবিবাহিতা। রাজা প্রশ্ন করলেন, যথাসময়ে কন্যার বিবাহ না হলে অশাস্ত্রীয় ব্যাপার বলে গণ্য হয়। দীননাথ তখন জানালেন, অনুপযুক্ত অপাত্রে কন্যাদান অশাস্ত্রীয়। কন্যাকে তিনি সর্ববিশারদ করে গড়ে তুলেছেন। কন্যা হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্যে দক্ষ, সমাজ, দর্শন, রাজনীতিতে প্রভূত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শিনী। অসিযুদ্ধে সম্ভবতঃ এ রাজ্যে ওই বীর কন্যার সমকক্ষ কোনো পুরুষ নেই। কন্যার স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা গড়ে উঠেছে। তাই কন্যা, উচ্চশিক্ষিত ও যুদ্ধবিশারদ ব্রাহ্মণ যুবক ছাড়া আর কারোকে বিবাহ করবেন না।

ক্রমশঃ

শ্রীমৎ দর্শনানন্দজীর শ্রীমুখে

(কৈলাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

দর্শনানন্দজী বলেছেন - আমার সঙ্গে স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজজীর সম্পর্ক ছিল স্নেহ ও ভালোবাসার - সে স্নেহ বলে বোঝানো যাবে না। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় দেশপ্রিয় পার্কে রাত বারোটার সময়। সে সময়ে চৈতন্য মহাপ্রভুর উৎসব উপলক্ষে সেখানে এক বিশাল অনুষ্ঠান হচ্ছিল। উনি আমাকে বললেন আগামীকাল নগর সংকীর্তন হবে। শীতের দিন, ওনার মাথায় পাগড়ি ছিল। পায়ে ছিল টায়ারের চপ্পল। রাত্রে দেশপ্রিয় পার্কের বেঞ্চে শুয়ে থাকতেন। সেই পার্কে রাত্রে আমরা ছিলাম - সেই রাত্রেই আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। পরে আমাকে নিয়ে বেনারসে গিয়েছিলেন। শিবের মন্দিরে দেখলাম, শিবলিঙ্গের মাথায় ভক্তরা জল ঢালছেন - আবার শিবানন্দ মহারাজ বসেছিলেন - হর হর মহাদেব বলে ওনার মাথাতেও অনেক ভক্ত জল ঢালছেন। সেইদিনই আমার মনে হয়েছিল উনি সাধারণ কেউ নন। আমাকে বললেন, জানিস! নামেতে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়। আমি তখন একটু আসন-টাসন করতাম, বললাম তাই নাকি? নাম এত শক্তি ধরে? আমাকে বললেন, আমি বিডন স্ট্রীটে প্রতি শনিবার কীর্তন করি। তুই আসবি, সন্ধ্যে সাড়ে ছটায়। তখন তিনি কাঁকুরগাছিতে থাকতেন। আমি শনিবার বিডন স্ট্রীটের ঠাকুর বাড়িতে গেলাম। দেখলাম তিনি কীর্তন করছেন। - তাঁর সর্বঅঙ্গে শিহরণ। আমারও সেদিন শিহরণ জেগেছিল কীর্তন শুনতে শুনতে। সেদিনই প্রথম উপলব্ধি করলাম যে কীর্তনে কুল- কুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। গিরি মহারাজ উনিও যা বলেছেন, আমাদের গুরুমহারাজজীরও সেই একই মত পরবর্তীকালে তাঁর শ্রীচরণাশ্রিত হয়ে আর তাঁর কাছে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হয়ে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। কীর্তনের সময় ঘড়ি দেখা, উঠে চলে যাওয়া বা অন্যমনস্ক হওয়ায় 'নাম অপরাধ' ঘটে যায়। 'কীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।' কীর্তনের পর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কীর্তনের ভাব অনুভব করার চেষ্টা সবাইকারই করা উচিত - মৌনতার মধ্য দিয়ে কীর্তনপরবর্তী সকল কাজ সম্পূর্ণ করা দরকার।

গিরি মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, তুই শিবপূজা করিস - যদি প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জীবের মধ্যে শিবকে না দেখতে পাস তো শিবপূজা হয় না - 'আসলে ভালোবাসাই আসল শিবপূজা।'

এরপর আমি অমর কন্টক গিয়েছিলাম। জায়গা পেলাম নাগাবাবার কাছে। নাগাবাবা ঐ ধুনিতেই রুটি বানাচ্ছেন - আমাদের গরম রুটি দিলেন। জানতে পারলাম এই অমরকন্টকে গোরক্ষনাথ, যাজ্ঞবল্ক্য, দত্তাত্রেয়, ভৃগুঋষি প্রভৃতি সকলেই তপস্যা করেছেন। তার ভাইব্রেশন এখনও পর্যন্ত আছে।

এটা ধ্যান করবার জায়গা। আমি প্রাত:কৃত্য করতে জঙ্গলে গেলাম, জঙ্গলে গাছের উপরে ভীমরুলের চাক আছে আমি জানতাম না। হাজার হাজার ভীমরুলের তাড়া খেয়ে আমি দৌড়ে আসছি। চীৎকার করছি তারস্বরে। গিরিমহারাজ তখন বসে আছেন ধুনির সামনে - সেখান থেকে আমাকে একটা কম্বল ছুঁড়ে দিলেন। বললেন সেটা গায়ে দিতে। জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কী করেছিলে? বললাম

গাছের তলায় বাথরুম করছিলাম। বললেন, তুমি ভুল করেছ - মুনি ঋষিরা বৃক্ষরূপে সাধনা করেন। তাই তোমাকে তাড়া করেছে।

কপিল মুনির আশ্রম - আমরা ঝর্ণার জলে স্নান করে সকাল আট টায় একটা ট্রাকে উঠেছি। বিলাসপুর যাব। স্টেশনে এলাম। সেখানে খোলা আকাশের নীচে গিরিমহারাজ শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। যাইহোক আবার ট্রেনে উঠে হাওড়া স্টেশন পৌছালাম। কোন ট্যাক্সি নেই, হেঁটে বিডন স্ট্রীট পৌছলাম।

আমি বদ্রিনারায়ণে থাকি। আমার কান্না পায়, মন কেমন করে পুরানো কথা ভাবলে। আমি ডাইরিতে অনেক কিছু লিখে রেখেছি। সেগুলো আমার চলার পথের পাথেয়। উনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন আমাদের শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর কাছে। তিনি শিবানন্দজীর কথামত আমাকে সন্ন্যাস দিয়েছেন। ২৫ বছর ওখানে আছি। গিরিমহারাজজী যখন শেষবার বদ্রীনারায়ণে গেলেন, বললেন, 'আমি ভোলাগিরি আশ্রমে যাব না, আমার ভীষণ সাফোকেশন হচ্ছে' - এই বলে তিনি বালানন্দজীর তীর্থাশ্রমে থাকলেন আমার পাশের ঘরে। দেখছি সারারাত ধরে লিখছেন তাঁর পত্রিকার জন্য। ঘরে রুমহিটার ছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ভোর চারটের সময় তাঁকে চা দিলাম। বললেন, আজ চলে যাব। আমার কাছে কথা প্রসঙ্গে একটা কথাই বললেন, 'নাম যদি ভালভাবে মন লাগিয়ে করা যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়। মন শুদ্ধ হয়ে যায়। অনেক পড়লে কী হয়? কিছুই হয় না। আসল হল সরলতা, নাম স্মরণ আর নামে বিশ্বাস।' তবে ততদিনে আমি শ্রীশ্রীগুরুমহরাজজীর সঙ্গ করতে করতে এই ব্যাপারটা অনেকটাই বুঝে ফেলেছি।

আর আমাদের গুরুমহারাজজীকে তিনি এত শ্রদ্ধা করতেন এবং গুরুমহারাজজীর কাছে তিনিও ছিলেন অত্যন্ত স্নেহের।

জয় শ্রীশ্রীগুরুমহরাজজীর জয়

অমৃত বাণী

সত্ত্বভূমিতে উঠিতে না পারিলে ধর্মের দরজাতেই পৌছানো হইল না। প্রকৃত ভক্তি ঐ সত্ত্ব অর্থাৎ চিত্তের সমতা অবস্থাতেই লাভ হয়। সাধুসঙ্গের ফলে চিত্ত নিস্তরঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গ করিয়াও যদি চিত্ত অল্প ঝঞ্ঝাতেই দুলিয়া উঠে, সমভাবাপন্ন না হয়, তবে বুঝিতে হইবে সে চিত্ত জড় বা পাষাণ। সাধুসঙ্গের মহিমায় চিত্ত শুদ্ধ নির্মল হইয়া স্থির হইবেই হইবে।

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী

২০২৩ সাল	১৪৩০ সন	উপলক্ষ্য
১৫ই অক্টোবর	২৭শে আশ্বিন, রবিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ, ঘট স্থাপন ও নবরাত্রি ব্রতারম্ভ।
১৯শে অক্টোবর	১লা কার্তিক, বৃহস্পতিবার	শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর পঞ্চমীবিহিত পূজা প্রশস্তা।
২০শে অক্টোবর	২রা কার্তিক, শুক্রবার	মহাষষ্ঠী, শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর ষষ্ঠীবিহিত পূজা প্রশস্তা। সায়ংকালে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস।
২১শে অক্টোবর	৩রা কার্তিক, শনিবার	শ্রীশ্রীদুর্গামহাসপ্তমী। শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর নবপত্রিকা প্রবেশ, স্থাপন, সপ্তমীবিহিত পূজা প্রশস্তা।
২২শে অক্টোবর	৪ঠা কার্তিক, রবিবার	শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর মহাষ্টমী তিথিতে সন্ধিপূজার নির্ঘণ্ট। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে। **সন্ধিপূজা** ঃ সন্ধ্যা : ৪/৫২/৫৭ থেকে আরম্ভ। সন্ধ্যা : ৫/১৬/৫৭ গতে বলিদান। রাত্রি: ৫/৪০/৫৭ সেঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন।
২৩ শে অক্টোবর	৫ই কার্তিক, সোমবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর মহানবমী বিহিত পূজা প্রশস্তা। শ্রীশ্রীচণ্ডীযজ্ঞ ও পূর্ণাহুতি।
২৪ শে অক্টোবর	৬ই কার্তিক, মঙ্গলবার	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর দশমীবিহিত পূজা সমাপনান্তে বিসর্জন প্রশস্তা। বিসর্জনান্তে অপরাজিতা পূজা, বিজয়া দশমী কৃত্য। দুর্গাপুর আশ্রমেও এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।
২৮ অক্টোবর	১০ই কার্তিক, শনিবার	শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা দেওঘর আশ্রমে ও পুরী তীর্থাশ্রমে অনুষ্ঠিত হইবে।
১২ই নভেম্বর	২৫শে কার্তিক, রবিবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা মহোৎসব ও ভাণ্ডারা।
১৪ই নভেম্বর	২৭শে কার্তিক, মঙ্গলবার	দেওঘর আশ্রমে অন্নকূট মহোৎসব ও ভাণ্ডারা।
২১শে নভেম্বর	৪ঠা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা ও ভাণ্ডারা।
২২ শে ডিসেম্বর	৫ই পৌষ, শুক্রবার	দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর ১২০তম শুভাবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা, সাধুভাণ্ডারা ও কম্বলদান, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শীতবস্ত্র বিতরণ। জামির লেন সহ অন্যান্য সকল আশ্রমেও জন্মতিথি উৎসব পালিত হইবে।
২০২৪ সাল	**১৪৩০ সন**	
১লা জানুয়ারি	১৫ই পৌষ, সোমবার	ইংরাজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে বালিগঞ্জ, জামিরলেনস্থিত শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর বিশেষ পূজা, অভিষেক ও প্রসাদ বিতরণ।

দেওঘর ও অন্যান্য আশ্রমসমূহের উৎসবের অনুষ্ঠানসূচী

২০২৪ সাল	১৪৩০ সন	উপলক্ষ্য
১৪ই ফেব্রুয়ারী	১লা ফাল্গুন, বুধবার	দেওঘর আশ্রমে শুভ বসন্তপঞ্চমী তিথিতে ঁশ্রীশ্রীবালা-ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীমাতার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা অভিষেক, ভাণ্ডারা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা।
২০শে মার্চ	৬ই চৈত্র, বুধবার	পুরী শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরুমহারাজের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসব এবং রাত্রে শ্রীমহাপ্রসাদ সেবা।
২১শে মার্চ	৭ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার	দেওঘর আশ্রমে পরমগুরুমহারাজজীর আর্বিভাব তিথি উপলক্ষ্যে ৪দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীবিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, বিশেষ পূজা, অভিষেক, অখণ্ড নাম সংকীর্তন, ভাণ্ডারা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা।
২৪শে মার্চ	১০ই চৈত্র, রবিবার	সায়ংকালে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা।
২৫শে মার্চ	১১ই চৈত্র, সোমবার	শ্রীশ্রীদোল পূর্ণিমা, শ্রীশ্রী ঁবিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞের পূর্ণাহুতি, দেবীমন্দিরে পরাৎপর গুরু শ্রীশ্রীব্রহ্মানন্দ মহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ স্থাপনা তিথির বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা অভিষেক।
৬ই এপ্রিল - ৮ই এপ্রিল	২৩শে চৈত্র, শনিবার - ২৫শে চৈত্র সোমবার	হৃষিকেশ আশ্রমে সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বার্ষিকতিথি উপলক্ষ্যে ৩ দিবসব্যাপী শ্রীশ্রী ঁবিষ্ণুলক্ষ্মী যজ্ঞ, ভণ্ডারা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা।
১০ই এপ্রিল	২৭শে চৈত্র, বুধবার	পুরীর শ্রীশ্রীবালানন্দ তীর্থাশ্রমে শ্রীশ্রীমোহনেশ্বর মহাদেব মন্দিরে শ্রীশ্রীনর্মদেশ্বর শিবের ৬ষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ষোড়োশোপচার বিশেষ পূজা রুদ্রাভিষেক, যজ্ঞ এবং ভাণ্ডারা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে।
১১ই এপ্রিল	২৮শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার	দেওঘর ত পোবন আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমগুরুমহারাজজীর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, অভিষেক, ভাণ্ডারা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা।
১৪ এপ্রিল	১৪৩১ সন ১ লা বৈশাখ, রবিবার	বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বালিগঞ্জ, জামিরলেনস্থিত শ্রীশ্রীবালানন্দ আশ্রমে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর বিশেষ পূজা, অভিষেক ও প্রসাদ বিতরণ।

করুণানিধান তথাগত

শ্রীবিবেকাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

তিনি স্থির করলেন সংসার ছেড়ে চলে যাবেন। একদিন গভীর রাতে বাবার শোবার ঘরে গিয়ে জানালেন যে, আজ রাতেই তিনি সব ছেড়ে চলে যাবেন। ছন্দককে বললেন রথে করে তাঁকে নগরের বাইরে দিয়ে আসতে। ছন্দক তাঁকে নানা ভাবে বোঝাতে শুরু করলো যে, আপনি ঘর ছাড়বেন না; ঘরে আপনার নবজাত পুত্র রাহুল (= বন্ধন) রয়েছে - তাকে অনাথ করে দিয়ে যাবেন না - সে কার ভরসা কোরবে। আপনার পরমা সুন্দরী সর্বগুণাধার লোকময়ী স্ত্রী গোপাকে সবদিক দিয়ে বঞ্চিত করে যাবেন না, এই রাজ্যকে সুশাসকবঞ্চিত কোরবেন না। সিদ্ধার্থ জানালেন যে, তিনি গৃহত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা কোরেছেন। মাঝরাতে পুষা নক্ষত্রে গৌতম সব কিছু ত্যাগ করে, শাক্য, কোজ, মল্ল ও মৈনেয় নামক জনপদবাসীদের পার হোয়ে গেলেন। তারপর শরীরের সব আভরণ খুলে ছন্দকের রথে চাপিয়ে দিয়ে, তাকে রাজ্যে ফেরার আদেশ দিলেন। ছন্দক চোখের জল ফেলতে ফেলতে রথ চালিয়ে ফিরে গেলো। সেই সকালে তিনি নিজের মাথা কামিয়ে নিয়ে এক ব্যাধকে অনুরোধ করে তার সঙ্গে পোষাক বদল কোরে নিলেন।

জীবন চর্যার মধ্যে বোধিত্ব লাভের দিশা

শুরু হোলো পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ও সাধক জীবনের প্রস্তুতি। হাঁটতে হাঁটতে তিনি এলেন মগধ (বর্তমানে বিহার) রাজ্যের রাজগৃহে (রাজগীর) এক ধীরস্থির সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে নগরের পথে পথে ঘুরছেন জেনে নৃপতি বিম্বিসার তাঁকে ভিক্ষায় বাধা দিলেন, তিনি তাঁকে রাজ্য দান করার প্রস্তাব দিলেন। সিদ্ধার্থ রাজার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা কোরে জানালানে যে, পার্থিব বস্তুর প্রতি তাঁর আসক্তি নেই। রাজা তখন বললেন যে, আপনি বুদ্ধত্ব লাভ কোরলে, আমি আপনার ধর্মের আশ্রয় নেবো, আমায় তখন সেই অনুগ্রহ কোরবেন।

নানা জনের সঙ্গে বহুরকম পরিস্থিতিতে ও স্থানে আলোচনায় গৌতম বুঝলেন যে, শুধু যাগযজ্ঞ কোরেই মানুষের তত্ত্ববোধ আসে না এবং তাতে শুধু কষ্টই হয়। আবার মনকে নিষ্কাম না কোরে বনে বাস করে সাধনা কোরেও ইষ্টলাভ হয় না। অতএব, বিষয় বাসনা সহ কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ কোরেই শুধুমাত্র বোধিতে বোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মনের এই স্থিত অবস্থাকে সবদিক দিয়ে বিচার কোরতে কোরতে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হোয়ে নানা পথ প্রান্তর পার হোয়ে গৌতম গয়া সংলগ্ন নৈরঞ্জনা নামের নদীর তীরে এলেন। সেইখানের উরুবিল্লা গ্রামের এক ছায়া সুনিবিড় বটবৃক্ষ তলের (বোধিদ্রুম) মূল প্রদেশে (বর্তমান বুদ্ধগয়া) বুদ্ধত্ব লাভের অচল মনোভাব নিয়ে এই মহান ত্যাগী যোগাসনে কঠোর তপস্যা শুরু কোরলেন। তাঁর নিদারুণ প্রতিজ্ঞা ছিলো, স্থূল শরীরের সকল অংশের বিনাশ হোয়ে গেলেও বুদ্ধত্ব লাভ না করে ধ্যানাসন থেকে উঠবো না। কথিত আছে যে, 'মারসেনার' প্রভাব কাটিয়ে তিনি তাঁর কঠিন তপস্যায় উত্তীর্ণ হোলেন। তাঁর শরীর জরাজীর্ণ হোয়ে গেলেও ভরে গেল মহানন্দে। তাঁর শরীর মনে অহংভাব, হিংসাভাব

আর রইলো না। মোহনাশ করে সদা সর্বদা ধ্যানসুখ উপভোগ করে তিনি স্থিত হোলেন বুদ্ধত্বে। তাঁর দিব্য চক্ষুলাভ হোলো এবং তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার এলো। নির্বাণের উদারপথ খুলে দিয়ে শাক্যমুনি হোয়ে উঠলেন সাম্যের প্রকৃত আচার্য।

ধ্যান চোখ মেলে তিনি গাঁয়ের বধূ সুজাতার ভক্তিনম্র নিবেদন এক বাটি পায়েস গ্রহণ কোরে কঙ্কালসার মৃতপ্রায় শরীর রক্ষা কোরলেন।

এখানে রতনকুমার নাথের এক অপূর্ব প্রণাম নিবেদন উদ্ধৃত কোরছি -

"হে সুজাতা
কি করে চিনলে তুমি
ঐ ধ্যানস্থ মহাদেবকে?
তাঁর অস্থি পাঞ্জরের গভীরে
অন্তর্লীন মহাশক্তির দ্যোতনা
উপলব্ধি করলে কি করে?
কি করে ঐ আকাশ থৈ-থৈ উচ্চতার কাঁপনের
পরশ পেলে আপন হৃদয়ে?
এক বাটি সুধা তুমি তুলে দিলে
তাঁর ক্ষুধাক্লান্ত ওষ্ঠে
বসুধার পক্ষ থেকে;
তুমিই প্রত্যক্ষ করলে তাঁর স্বর্গীয় হাসি,
সেই অনন্ত জ্যোতির বিচ্ছুরণ
সেই দিগন্ত ভাসানো নিবেদন
হে সুজাতা, তোমায় প্রণাম।"

উদ্বোধন, ১১৭, ৩৩৮, ১৪২২

নির্বাণ

গৌতম বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করার পর ঠিক কি কি ভাবে তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে মানুষকে বুঝিয়েছিলেন, তা আজ আর সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী লোকেদের বিভিন্ন কালে এ বিষয়ের উপর লেখা বা বক্তব্যের উপর নির্ভর কোরে একটা ধারণা করা যেতে পারে মাত্র। এই কথা অনেকেই বলেছেন যে শরীর, মন ও মুখের ভাষার (কথার) থেকে কর্ম-সংস্কারের যে ধারণা আসে তাই 'ভব' বলে আখ্যাত। সব রকমের ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই নির্বাণ। যখন রাগ, দ্বেষ ও মোহকে সাথে নিয়ে অভিমানও লুপ্ত হয়, তখনই মনের সব জায়গাটুকুকে অধিকার কোরে নেয় পরম সত্য বা নির্বাণ। এতে সব তৃষ্ণা অবসান হোয়ে যায়।

নির্বাণের স্তরে জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার ছিঁড়ে নিয়ে, অহংকে নিঃশেষ কোরে 'আমি' ভাবকে ও সংসারকে মন থেকে সমূলে ধ্বংস কোরে দেয়। বস্তুতঃ নির্বাণ ঠিক মুখে বলা না হলেও, এটি আসলেচিরশান্তি ও মঙ্গলের পরমপদ। এই অনির্বচনীয় অবস্থাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ব্যবহারিক দিক থেকে আমি ও আমার সংসার মিথ্যা নয় বটে, তবে পরমার্থিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে প্রসারিত

হৃদয়ে ঐ দু'টিই মিথ্যা হোয়ে যায় এবং তখনই নির্বাণের অবস্থা চলে আসে। ব্রহ্মের স্বরূপ নিয়ে উপনিষদের বক্তব্যের সঙ্গে নির্বাণের ধারণার বেশ মিল আছে। সব শ্রেণীর মানুষের জন্য শাক্যমুনি নির্বাণমধু এনেছেন মধুপের (মৌমাছি) মতো, তাই তিনি নির্বাণ মধুদাতা করুণাময় বুদ্ধদেব হোয়ে রয়েছেন সকলের হৃদয়ে।

করুণার অবতার তথাগত

ছোটবেলা থেকেই গৌতম নিজের ভাবনা চিন্তা নিয়ে আপন খেয়ালেই থাকতেন। বিশেষ কারও সঙ্গে মেলামেশা কোরতেন না। যেটুকু আবশ্যিক সেইটুকুই কোরতেন। তাঁর মন খুবই উদার ও নরম প্রকৃতির ছিল। জীবে প্রেম তাঁর মনের ভিতর থেকে আসতো। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হবার আন্তরিক বাসনা তাঁর প্রবলভাবে ছিলো। শুষ্কদার্শনিক তত্ত্ব ও পুরোহিতদের ধর্মানুষ্ঠান করা নিয়ে বাড়াবাড়ি তাঁর মনে ধরতো না। পূজাঅর্চনার পর নানা প্রার্থনায় জাগতিক বস্তু কামনা করা তিনি ভালোবাসতেন না। তিনি ভাবতেন ঈশ্বর তো ধর্মের আবরণে কাম্যবস্তুর দোকান খুলে বসেন নি। তবে এই সব চাওয়া কেন? মনকে সকলের কথা অন্তর দিয়ে ভাববার অভ্যাস তাঁর পছন্দ ছিলো। পরের দুঃখ কষ্টে কাজে লাগতে পারলে প্রকৃত মানব ধর্মের সেবা হবে, এই বোধ তাঁর দারুণভাবে ছিলো।

রাজবাড়ীর কাছেই এক উপবনে রাজকুমার সিদ্ধার্থ নিজের মনেই চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ তাঁর কোলে এক শরাহত হাঁস এসে পড়লো। পরম যত্নে মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে তিনি শরটিকে তাঁর দেহ থেকে বার কোরে এনে ক্ষতস্থানে ওষধির প্রলেপ দিয়ে প্রাণীটিকে একটু আরাম দিলেন। হাঁসটি তাঁর কোলে আরামে মাথা গুঁজে রইলো। কিছু পরেই তাঁর পরিবারের এক সদস্য, দেবদত্ত এসে গৌতমের কাছে হাঁসটি চাইলো। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে শাক্য রাজকুমার বোললেন, হাঁসটি আমি তোমায় দেবো কেন? জীবটি কার? যে বাঁচায় তার না, যে মারে তার? দেবদত্ত জেদাজেদি করায় সিদ্ধার্থ বললেন, শোন! বরং শাক্যরাজ্য তোমায় ছেড়ে দেবো, কিন্তু আমার আশ্রিত যে আহত হাঁসটিকে বাঁচিয়ে তুলেছি, তাকে আমি ছাড়তে পারবো না।

সমাজে যখন ধর্মের গ্লানি ও অবক্ষয়কে আশ্রয় কোরে নানা কুপ্রথা ও অর্থহীন পূজা ও আচার শিকড় গাড়তে থাকে তখনই দরকার হয় একজন হৃদয়বান মানুষের, যিনি মানব ধর্মের জয়গান গেয়ে মানবসমাজকে সঠিক পথ দেখাতে পারেন। মানুষের ও অন্যজীবের প্রতি ভালোবাসা, করুণা ও নিখাদ প্রেম দেওয়ার কথা বরাবরই মানুষের মনের মনিকোঠায় স্থান পায় ও ব্যক্তিটিকে স্মরণীয় কোরে দেয়। রাজা বিম্বিসারের কোন পূজা অনুষ্ঠানে তথাগত একসময় হাজির ছিলেন। ছাগবলির অনুষ্ঠানে মর্মাহত গৌতম, নৃপতিকে বোললেন যে, রাজন! আপনার যদি মনে হয় যে, বলিদান না দিতে পারলে পূজা সম্পূর্ণ হয় না, তবে আমায় বলি দিয়ে তার বিনিময়ে দয়া কোরে ছাগশিশুগুলিকে মুক্তি দিন এবং এতে আপনার বেশী পুণ্য অর্জন হবে। এমনই ছিলো তাঁর ফুলের মতো কোমল অন্তর।

করুণা তাঁর কোন পথ দিয়ে আসতো বুঝা যায় না। নানাভাবে তিনি তাঁর প্রেমের স্পর্শ দিয়েছিলেন, যেমন শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষে শিশুদের ডেকে ঘরে ঘরে মুষ্ঠিভিক্ষা কোরে ক্ষুধিতদের মুখে অন্নের ব্যবস্থা শিষ্য শিষ্যার মাধ্যমে কোরেছিলেন।

ক্রমশঃ

মাতৃ আবাহন

শ্রীমতী অরুণিমা বসুমল্লিক

সাজিয়ে বরণডালা মাগো
রয়েছি অপেক্ষায়
কবে তুমি আলো করে
আসবে মা হেথায়।
কাশ বনের ঐ দোদুল দোলা
শিহর জাগায় বুকে
শিউলি ফুলের গন্ধে মাতাল
মন ভেসে যায় সুখে।।
পদ্মরাগে রাঙিয়ে তোমার
রাঙা চরণ দুটি
করব পুজন লব শরণ
মোর হৃদপদ্ম উঠবে ফুটি।
বন্দনা গানে ভরিব ভুবন
কুসুম মালিকা করিব সৃজন
কাশ-চামরে তোমায় করিব ব্যজন
চিদাকাশে স্পন্দিবে তব আগমন।।

দেব মহারাজ

শ্রীমতী মেখলা দত্ত

হৃদয় জুড়ে নামে আঁধার
কোথায় আলোর উৎস দেব মহারাজ
চারিদিকে অশান্ত ঝড়ের আভাস
মাতাল সমুদ্র আজ বীভৎস রূপে
চাইছে ধ্বংস লীলা পৃথিবীর বুকে
নটরাজের নৃত্য আজ উথাল পাতাল
প্রলয় নৃত্যে মুক্ত জটার সম্ভার
হলা হলে তীব্র তিক্ত দেব মহাদেব
অসহ বেদনায় আজ রুদ্র তেজে দীপ্ত

বহু প্রার্থনায় আজ তোমাকে স্তুতি
এস এস মহারাজ অগতির গতি
আঁধার ভেদ করে তুমি আলোর দিশারী
কোথা আছ দেব তুমি এস দু:খ নিবারী
তোমার দর্শনে পায় পূর্ণের পূর্ণতা
আবার আসুক নেমে হেথা তথা হোতা
তোমার বিশ্রামহীন শান্তির বার্ত্তা
গানেতে প্রেমেতে তা দূর করে হিংসা
নাম দানে মুগ্ধ করে আনো তুমি শান্তি
হিংসা মত্ত পৃথ্বির আনুক প্রশান্তি
অশুভ অশুচি আজ হোক দূরীভূত
তোমার জ্যোতিতে ঘুচুক মন্দ যত
পরম পাবক তুমি দেব ভগবান
আমরা সবাই তোমায় করিগো প্রণাম।।

ভক্তিতে মুক্তি

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

"আজি আকাশে বাতাসে দিগন্ত প্রসারী
ছুটেছে অনন্তবাণ -
পাখির কলরবে, - নদীর কলতানে;
ভরিয়া উঠিছে প্রাণ।
আজি শুভলগ্ন বেলায় -
জাগে মাঙ্গলিক গান!"

জনৈকা গুরুভগ্নীর লেখা

গুরুমহারাজজীর আগাম বাণী যেন সবাকার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়ে জানিয়ে দিচ্ছে- "তোর মা যে আজি এলো দ্বারে, এলো এলো এলোরে বুকের আঁচলখানি ধুলায় পেতে আঙিনাতে ধরোরে"..... সত্যিই বাঙালীরা সারা বছর এই 'মা' আসার অপেক্ষায় থাকে। দূর দুরান্তে, দেশ-বিদেশে যেসকল ভক্তরা থাকেন, তাঁরাও যেন এই সময়ে নিজের ঘরে কটাদিন এসে আনন্দ করে কাটাতে চায় আর যাঁরা এখানে থকেন তাঁরা আবার ভীড় এড়ানোর জন্য এখান থেকে কোন ফাঁকা জায়গায় গিয়ে অন্যরকম ছুটির আমেজ পেতে চান।

আর আমাদের গুরুদেব দেওঘর আশ্রমে যে দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন এবং প্রতিবছর নিজেই সেই পুজোর পৌরোহিত্য করতেন, সকল গুরুভাই বোনেরা তাঁর সেই দিব্যজ্যোতির আকর্ষণে আশ্রমে ছুটতেন, আশ্রম প্রাঙ্গণে তিলধারণের জায়গা থাকত না। সেই স্থানটি একে অপরের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠত।

আজও তার অন্যথা হয় না, সাধুবাবা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তা বজায় রেখেছেন; ব্যবস্থাপনার কোন ত্রুটি থাকেনা। তফাৎ শুধু একটাই যেটা গুরুমহারাজজীর আমলেও ছিল; পরিবর্তনশীল জগতে সর্বক্ষণই সবকিছুরই পরিবর্তন হয়ে চলেছে সেটা হল বিভিন্ন সময়ে গুরুমহারাজজীর পার্ষদগণের। কালের আবর্তনে একদল এসেছেন, তাঁরা চলে গেছেন আবার এসেছেন অন্য কোন পার্ষদরা; আজও সেইটাই বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এইটাই তো জগতের নিয়ম।

মহারাজজী বলেছেন, গুরুর রূপগুণ ধ্যান করলে সেটাই পাবে, তাতে গুরুকে সত্যিকারের পাওয়া হবে না। সদাসর্বদা তাঁকে স্মরণ মননই তাঁকে পাওয়া, তাঁর সঙ্গ করার সমান। তার জন্য দরকার অভ্যাস, অভ্যাসের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব, তুলসীদাস বলেছেন,

"দুখমে সব হরিভজে সুখমে ভজে কই
সুখ্‌মে যব হরিভজে দুখ কাঁহাসে রই?"

আনন্দময় বা আনন্দময়ীকে বাদ দিয়ে কী কখনো আনন্দ পাওয়া যায়? যায়না। আমাদের হতে হবে তাঁর অনুবর্তী; তিনি যখন যা দেবেন তা সুখ অথবা দুঃখ যাইই হোক না কেন নত মস্তকে আমাদের

সেটার মধ্যেই মঙ্গল খুঁজে নিতে হবে। যাঁর কৃপায় এ আনন্দ ঘটছে তাঁকে সর্বদাই স্মরণে রাখতে হবে।

মা আনন্দময়ীর স্তোত্রে আছে, 'জ্যোতিসে জ্যোতি জ্বালায়ো মা' সেইরকম একটি প্রদীপ থেকে যেমন অনেক প্রদীপ জ্বালানো যায় - মনের ভক্তি বিশ্বাস, ভগবৎ ধারণাও তেমনি এক থেকে অন্যে সংক্রামিত হয়। এইজন্য সাধুসঙ্গ সৎসঙ্গের খুব দরকার।

গুরুমহারাজ আমাদের বলতেন ঘরে বসে ডাকলেও তিনি অবশ্যই সাড়া দেন আর দিয়েছেন এবং এখনও দিয়ে আসছেন - তবু তাঁর সঙ্গ পেতে আমরা রোদ, বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা সব উপেক্ষা করেও ছুটে যেতাম কেন?..... তাতে করে তিনি আমাদের যাকে বলে রিচারড্ করে দিতেন মানে আমাদের শোধন করে দিতেন। আমাদের মনে বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালাতে তিনিই শক্তিদান করেন। তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ; তবু তাঁর দিনলিপি পর্যালোচনা করলে আমাদের এটুকু বুঝতে বাকী থাকে না যে তিনি, "আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখান" অর্থাৎ আমাদের প্রতিনিয়ত কীরকমভাবে চলা দরকার তা তিনি বহুপন্থাতেই আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা করে গেছেন।

তিনি যখন পূজামণ্ডপে মায়ের আরতি করতেন, তখন যেন তাঁতে আর মা-এর মধ্যে ঝলকে কোন তফাৎ মনে হ'তনা, এযেন নিজেই নিজেকে আরতি করছেন বলে মনে হত। মন যদি সবসময় তাঁকে স্মরণে রাখতে পারে, তবেই আমাদের তপস্যা সিদ্ধ হবে। আর যদি আমরা, "আমার আমার বলে ডাকি, আমার এও, অমার তা".... এই পন্থাতে চলি তবে ভগবানকে তো ভালোবাসাই হ'লনা, "কী লয়ে যে গর্ব করি ব্যর্থ জীবনের, ভরা জীবন শূন্য তবু তোমার বিহনে".... সেটাতো আমরা চাইনা, তাই সম্পূর্ণ নির্মল তীব্র অনুরাগের ভক্তি দিয়ে আসুন আমরা মাতৃরূপী শ্রীগুরুচরণে অঞ্জলি দিই আর নিজেদের কামনা বাসনা যত, সব বিসর্জন দিই তবু, "মাগো তোমায় পাবার আশা, ছাড়ব না মা ছাড়ব না..."

জয়গুরু

জয় শ্রীশ্রীদুর্গামাতা

"এই মাতৃমিলন জীবনের ক্রমবিকাশের পাঁচটি স্তর আছে ঃ প্রবোধন, পরিষ্করণ, প্রকাশ ও আত্মহারা, অপ্রকাশ এবং মহামিলন। মধুকৈটভবধই তমোনাশন বা প্রবোধন, মহিষাসুর বধই রজোগুণের বিলোপ সাধন বা পরিষ্করণ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের মধ্যেই অহমিকার বিলোপসাধন এবং সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা - সত্ত্ব প্রতিষ্ঠ হইলেই আমরা অমৃতানন্দের অধিকারী হইতে পারি। তখনই এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আত্মতৃপ্তি, আত্মরতি ও আত্মসন্তুষ্টিলাভ করিয়া আমরা আমাদের জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে পারি।"

-গুরুমহারাজজী

সম্পাদকীয়

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী"

"শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি".....

এই বাংলায় ষড়ঋতু বিশেষভাবে প্রকটিত। বর্ষার পরে বৃষ্টিস্নাত উদ্ভিদ্ সকল উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, নীল আকাশে সাদা মেঘেদের ভেলায় চ'ড়ে আনাগোনা, সে বড় মনোরম, পুজোর গন্ধ যেন ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিগন্তে, "শিউলির ডালে কুঁড়ি ভ'রে এলো টগর ফুটিল মেলা...." সাদা সাদা কাশফুলগুলো হাওয়ায় যখন দুলতে থাকে তখন পথের পাঁচালীর দুর্গার কথা মনে পড়ে যায় - যে ছোটভাই অপুর কাছে ট্রেনে চড়বার আবদার জানিয়েছিল।

বাঙালী উৎসবপ্রবণ - সারা বছরই তার পার্বণ লেগেই থাকে, তবে এই শরৎঋতুতেই যে স্বয়ং 'মা' কৈলাস থেকে বছরে একবার আসেন বাপের বাড়ি - সঙ্গে গণেশ কার্তিক আর লক্ষ্মী সরস্বতীকে নিয়ে। এতো উৎসব নয় মহোৎসব।

মহালয়ার মহালগ্ন পেরোতে না পেরোতেই ঘরে ঘরে মঙ্গলদীপ জ্বলে ওঠে; আমাদের গুরুদেব গেয়েছেন, "বরষের পরে কাঙালের ঘরে এলি কিমা তুই এলি আবার" - এখানে কাঙাল বলতে মাকে পাবার জন্য আমাদের মনের আকুলতাকেই বোঝানো হয়েছে। শিবের ঘরণী, দনুজদলনী সিংহবাহিনী মহাসমারোহে আসছেন। চারিদিকে সাজো সাজো রব। বর্তমানে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ খুব একটা অনুকূল না হওয়ায়; ত্রিতাপহারিণী মায়ের উপরেই সবার ভরসা - তিনিই একমাত্র পারেন অশিব নাশ করতে।

'মার্কণ্ডপুরাণে দেবীমাহাত্মের বর্ণনায় সেই মহাশক্তি চণ্ডীরূপে প্রকটিতা হয়েছেন'। তিনি সৌম্যরূপে জগৎ পালন করেন আবার রুদ্রাণীরূপে আসুরী শক্তির বিরুদ্ধে ভীমরবা, ভয়ঙ্করী। তাই দেবী আরাধনার ফলও দ্বিবিধ - ভুক্তি ও মুক্তি।

সেই মহামায়া দেবী দুর্গার বোধন ও পুজো আজ সমাগতপ্রায়। মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ীরূপে ভক্তের দ্বারা পূজিতা হতে আসছেন, তাই শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী গেয়েছেন -

"পথে সেচন করো গন্ধবারি, যেন মলিন না হয় চরণ তাঁরি....।"

জয়গুরুমহারাজজী

জয়মাদুর্গা